

অরূপরতন ভট্টাচার্য

বিজ্ঞানীর দপ্তর



৯৪২

বিজ্ঞানীর দপ্তর

অরূপরতন ভট্টাচার্য

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

ডঃ অমিয়বিকাশ চৌধুরী

প্রাক্তন অধিকর্তা, স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন, কলিকাতা

—শ্রদ্ধাস্পদেষু

প্রথম প্রকাশ :
আশ্বিন, ১৩৮৫
অক্টোবর, ১৯৭৮

দ্বিতীয় সংস্করণ :
মাঘ, ১৩৮৬
ফেব্রুয়ারী, ১৯৮০

তৃতীয় সংস্করণ :
কলিকাতা পুস্তকমেলা
ফেব্রুয়ারী, ১৯৮০

ষষ্ঠ সংস্করণ :
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৪
মে, ১৯৮৭

প্রকাশক :
সুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ :
গৌতম রায়

মুদ্রাকর :
শ্রীমণীন্দ্রনাথ মান্না
পারুল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৫/১ ঈশ্বর মিল লেন
কলিকাতা ৭০০০০৬

দাম : ~~৮ টাকা~~ ১২/-

নিবেদন

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তোলায় 'বিজ্ঞানীর দপ্তর-এর' মত গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন এবং উপযোগিতা আছে মনে করি। যে বিজ্ঞানের সঙ্গে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে, বিজ্ঞানের সেই ধরনের বিষয়বস্তুর দিকে সকলের আগ্রহ বেশি। এইসব বিষয় সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ধারণা জীবনকে সংস্কারমুক্ত করে তুলতে সাহায্য করবে ভরসা রাখি।

আনন্দমোহন কলেজ
কলিকাতা ৭০০০০৯ — অরূপরতন ভট্টাচার্য
১৯. ৯. ৭৮

এই লেখকের অন্যান্য বই ঃ

অঙ্ক নিয়ে বুদ্ধিবিচার
সেখানে এদেশে বিজ্ঞানচর্চা
বিজ্ঞানীর নোটবুক
অণু পরমাণুর দেশে
প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান [রবীন্দ্র পুরস্কার, ১৯৭৬]
বিজ্ঞান জিজ্ঞাসুর ডায়েরী
আকাশ চেনো
আমরা কেন আমাদের মত দেখতে
রম্য গণিত
গল্পে গল্পে বিজ্ঞান
নিউটন গেলেন, আইনষ্টাইন এলেন
প্রাচীন ভারতে গণিত
পৃথিবীর বাইরে কি বুদ্ধিমান জীব আছে ?
কার কেমন আকার
মা'পের রকম ফের
কাঠি নিয়ে কঠিন খেলা
সংখ্যার অসংখ্য খেলা
বৈঠকী ধাঁধার খেলা
ধাঁধা নিয়ে মজার খেলা
কেমন করে বছর ঘোরে
রোবোট এল কেমন করে

বিষয় সূচী

এই শহরে
কতটা বৃষ্টি হলে জল দাঁড়াবে ?

এই যে বর্ষার বৃষ্টিতে শহরে যখন তখন যত্রতত্র জল দাঁড়াচ্ছে, তাতে সাধারণ সকলের মনে একটা প্রশ্ন দেখা দেবে, কি পরিমাণে বৃষ্টি হলে, যদি গণিতের দৃষ্টিভঙ্গীতে বলি—ঘণ্টায় কতটা বৃষ্টিপাতে এই শহর জলে ডোবে বা জলে ভাসে ?

শহর এবং শহরতলী জুড়ে কলকাতার পরিধি কম নয়। এই বিস্তীর্ণ কলকাতাকে করপোরেশনের হিসেবে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। উত্তর কলকাতা ও দক্ষিণ কলকাতা। লোয়ার সারকুলার রোডের উত্তরে উত্তর, তার দক্ষিণে দক্ষিণ। এই উত্তর-দক্ষিণের কলকাতায় জল নিষ্কাশনের জন্যে ভূ-গর্ভে যে পাইপ বসানো হয়েছে আজ থেকে ৭৫/৮০ বছর আগে, সেই পাইপই আজও শহরের জল নিষ্কাশিত করে চলেছে।

এই যে পাইপ, এর জল নিষ্কাশনের ক্ষমতা কি রকম ? উত্তর-দক্ষিণে জল নিষ্কাশনের হার কি সমান ? না, সমান নয়। নিষ্কশনের হার দুদিকে দু-রকমের। পাইপের ব্যাস এবং বিন্যাস-ব্যবস্থা অনুসারে উত্তর কলকাতায় যদি ঘণ্টায় $\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি বা ৬ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হয়, তাহলে সে-জল বেরিয়ে যাবে, শহরের বুকে দাঁড়াবে না। দক্ষিণে জল টানার ক্ষমতা তুলনায় কম। সেখানে ঘণ্টায় $\frac{১}{৬}$ ইঞ্চি বা ৪ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাতে শহর জলমুক্ত থাকবে। এই ৪ মিলিমিটার বা, ৬ মিলিমিটার হার খুবই সামান্য, বিশেষ করে বর্তমান শহরের জটিল পরিস্থিতিতে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় কলকাতা শহরে যখন এই নিষ্কাশন ব্যবস্থা প্রথম চালু করা হয়, তখন শহরের যে চেহারা ছিল আজকের জনবসতি এবং দৃশ্যপটের সঙ্গে তার অল্পই মিল আছে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় এই শহরের জনসংখ্যা এবং আজকের

জনসংখ্যার মধ্যে কোনো রকমের তুলনাই চলে না। স্বাধীনতা লাভের পর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সমান্তর, গুণোত্তর, বিপরীত সকল প্রগতিকেই অতিক্রম করে গিয়েছে।

তা ছাড়া করপোরেশনের পাইপ যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি সে-উদ্দেশ্যও ব্যাহত হয়েছে অনেকখানি। কী না জমা হচ্ছে এই পাইপের অভ্যন্তরে। রাজ্যের আবর্জনা ঝাঁঝরিবিহীন পাইপ, ঢাকনাবিহীন ম্যানহোলের ভেতর দিয়ে গিয়ে জমা হচ্ছে পাইপের মধ্যে, যা স্তূপীকৃত হওয়া উচিত ছিল ধাপার মাঠে। তা ছাড়া আছে ডাবের খোলা। দীর্ঘকালের ইতিহাসে করপোরেশনের জলনিকাশী পাইপে যে-সংখ্যক শুধু ডাবের খোলা জমা হয়েছে তার কে হিসেব রাখে? এরপর বা এর উপরে আছে পলি। বহুদিন ধরে পাইপের মধ্যে ক্রমাগত পলি জমা হচ্ছে। ফলে নানা কারণে পাইপের মুখ রুদ্ধ না হলেও কমপক্ষে সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে। সুতরাং আজ পাইপের মুখে প্রচণ্ড চাপ এবং বর্ষায় নাগরিকদের চূড়ান্ত দুর্ভোগ। এখন এই চাপের মুখে দাঁড়িয়ে এবং নাগরিক দুর্যোগের দিকে তাকিয়ে যদি বিশেষজ্ঞদের প্রশ্ন করা যায়, আপনারা কি এই জল-নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতির জন্যে কিছু করেছেন?

তথ্য যা আছে তা তুলে ধরে তাঁরা বলবেন, হ্যাঁ করেছি। জল নিষ্কাশনের জন্যে বর্তমানে যে-সব ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তা হল: করপোরেশনের ১৭টি পাম্পিং স্টেশনের ৭০টি পাম্প শহরে জল যাতে বেশিক্ষণ না দাঁড়ায় তার জন্যে কাজ করে যাচ্ছে। নতুন পাইপ লাইনও বসানো হয়েছে। হুগলি দিয়ে জল বের করার জন্যে কয়েকটি বহির্মুখও আছে।

এইসব ব্যবস্থা অবলম্বন—শহরে জল যাতে অনেকক্ষণ না দাঁড়ায় এবং দাঁড়ালেও তা যাতে দীর্ঘ সময়ের জন্য স্থায়ী না হয়—তার উদ্দেশ্যে।

মানলুম। কিন্তু ব্যবস্থা যে যথেষ্ট নয় সে-সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ আছে কি? তা ছাড়া হুগলির বহির্মুখ তেমন বর্ষায় জল

বেরোনোর কাজে কতটা সাহায্য করে? ভালভাবে বর্ষা নামলে হুগলির জলের উপরিভাগ অনেক উন্নত হয়। আর সে-উপরিভাগ যদি পাইপের তলদেশের চেয়ে নীচে না থাকে? জলের ধর্ম অনুসারে জল তো উপর থেকে নীচে বইবে। তখন তো হুগলির জলই চলে আসবে ভিতরে। তাহলে দুর্দান্ত বর্ষায় হুগলির জল-নিষ্কাশনের কাজে কতটা সাহায্য করবে? অবশ্য হুগলির বহির্মুখ ছাড়া আছে টালির নালা এবং সেই সঙ্গে সারকুলার ক্যানাল।

তবু কেন সাধারণ সকলের মনে সংশয়? তবু কেন মনে হয় জল-নিকাশী ব্যবস্থার তেমন কোনো উন্নতি হয়নি? বরং আমরা বলি, কয়েক বছর পূর্বে যে-পরিমাণ বৃষ্টিতে যতটা জল দাঁড়াত এই শহরে এখন কেন তার চেয়ে কম বৃষ্টিতে তুলনায় বেশি জল দাঁড়াচ্ছে?

সাম্প্রতিককালে এই শহরে বর্ষণের উল্লেখযোগ্য যতগুলি বছর গেছে তার মধ্যে ১৯৭৭ একটি। করপোরেশনের পামারবাজার পাম্পিং স্টেশনের হিসেব দেখেছি। ১৯৭৭ সালে জুন, জুলাই আর অগাস্ট মাসে জল জমার হিসেবে এমন প্রায় একটা দিনও নেই, যেদিন ঘণ্টায় একাধিক বার জল জমার মত ৪/৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়নি। জুনের ২৪ থেকে ২৮ পর্যন্ত, জুলাইয়ের ১৩ আর ১৪, অগাস্টের ৭...এইসব তারিখের বেশিরভাগ দিনই বেশ কয়েকবার ঘণ্টায় ৬ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য দুটি দিন, জুলাই ১৩ আর অগাস্ট ৭।

জুলাই ১৩ তারিখে পামারবাজার পাম্পিং স্টেশনের হিসেব অনুযায়ী বৃষ্টিপাতের পরিমাণ: ১২২·২৫ মিমি; অগাস্টের ৭ তারিখে ৯০·৭৫ মিমি। এখন জুলাইয়ের ১৩ তারিখ সকাল থেকে ১৪ তারিখ ভোর পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের একটি ধারাবাহিক সময়চিত্র তুলে ধরা যাক:

সকাল	৮-৪০ থেকে ৯-১০	১২·২৫ মিমি
	৯-১০ থেকে ৯-৪০	৬·৫০ „
	১১-২৫ থেকে ১১-৪০	১·৫০ „
	১১-৪০ থেকে ১-০০	২·৫০ „

দুপুর	১-০০ থেকে ৩-০০	৪·২৫	মিমি
	৩-০০ থেকে ৪-০০	১·২৫	”
বিকেল	৪-০০ থেকে ৪-৩০	১০·৫০	”
	৪-৩০ থেকে ৫-০০	৯·০০	”
	৫-০০ থেকে ৬-০০	১০·২৫	”
	৬-০০ থেকে ৬-৩০	৩·৭৫	”
	৬-৩০ থেকে ৭-০০	২·২৫	”
ভোর	৩-৩০ থেকে ৪-৩০	২০·০০	”
	৪-৩০ থেকে ৫-০০	২২·০০	”
	৫-০০ থেকে ৫-৩০	১৬·২৫	”
		১২২·২৫	মিমি

সময়নির্ভর এই সংখ্যাচিত্র থেকে একটি বিষয় সুস্পষ্ট, সারাদিন একটানা তেমন বৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ৬ মিলি-মিটারের চেয়ে বেশি বৃষ্টি হতে পারে। ঘণ্টায় ৬ মিলিমিটার তো সামান্য ব্যাপার। প্রায় ২৪ ঘণ্টার হিসেবটিতে জল জমে শহর ভেসে যাবার মত বৃষ্টি হয়েছে কম বারের মত নয়। আধ ঘণ্টাতেই বৃষ্টির পরিমাণ কখনো ১৩, কখনো ১৬, কখনো আবার ২২ মিলিমিটার। অর্থাৎ ওইসব সময়ে মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছে এবং জমার জন্যে যে সামান্য ৪ বা ৬ মিলিমিটার প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক বেশি বৃষ্টি নেমেছে। আলিপুর আবহাওয়া অফিসেও বৃষ্টিপাতের দৈনিক ধারাবাহিক রেখাচিত্র আছে। সে-রেখাচিত্র লক্ষ্য করলে এ-রকম একটা সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, ১ ইঞ্চি বা ২৫ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে এমন দিনের মধ্যে খুব অল্পই নজীর নজরে আসে যেদিন কোনো না কোনো ঘণ্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ জল দাঁড়াবার মত নয়। ভেবে দেখার মত অবস্থাটা নিশ্চয়ই। সংশ্লিষ্ট সকলেরই চিন্তা করার মত, সন্দেহ নেই।

তা ছাড়া আরও একটি বলার বিষয় আছে। তা হল শহরের নীচু

জায়গাগুলি। এই শহরে যদুবাবুর বাজার, ল্যান্সডাউন, ঠনঠনের মত নীচু জায়গার অভাব নেই। জল না জমার মত বৃষ্টি হলেও অন্য অঞ্চলের জল গড়িয়ে এসে সেখানে সাগর বয়ে যায়। কলকাতা পরিকল্পনাবিহীন নগর হওয়ার জন্যে এ এক দুঃসহ অবস্থা।

কে জানে, অদূর ভবিষ্যতে বর্ষার দিনে হাঁটু জলের শহর এই কলকাতার অবস্থা বদলাবে কি না!

ডাবের জলে কি উপকারী?

এই গরমে ডাব এক দুর্মূল্য পানীয়। আধ গেলাস ডাবের জল ষাট পয়সা, সত্তর পয়সা, বেশি হলে তো আর কথাই নেই, অথচ তার চাহিদাও অসামান্য। দিনের শেষে রাস্তার কোণায় এক ডাবওয়ালার জড়ো করা ডাবের খোলার সামনে দাঁড়িয়ে যে-কোনো লোকেরই এ-কথা সঙ্গত কারণে মনে হতে পারে, এই যে ডাব, প্রচণ্ড গরমে, চড়া দাম দিয়েও যে সমান চাহিদা বজায় রেখে চলেছে, নিশ্চয়তার মধ্যে এমন পদার্থ আছে, নিশ্চয় সে এমন গুণযুক্ত যা ছিপি-আঁটা অন্য কোনো পানীয়ের নেই—কুম্ভকারের তৈরী মাটির কলসিতে রাখা সুস্বাদু এক গেলাস ঠাণ্ডা জলেরও নয়।

এই সময়ে একটি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই মনে আসে, তাহলে ডাবের জলে কি আছে? কোন্ অতিরিক্ত খাদ্যগুণের জন্যে সে আমাদের কাছে আকাঙ্ক্ষিত? না কি এ আমাদের কাছে এক অভ্যেস, এ আমাদের কাছে এক বিলাসমাত্র।

খাদ্য বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, ডাবের জলে আছে পটাশিয়াম, ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম এবং কিছুটা গ্লুকোজ। এক গেলাস ডাবের জল এদের সমন্বয় ভাল এবং পাওয়া যায় যথেষ্ট পরিমাণে।

এইসব রাসায়নিক পদার্থের সঙ্গে আছে সোডিয়াম কিন্তু তার পরিমাণ খুবই কম।

আমাদের শরীরে বিবিধ রাসায়নিক পদার্থের আবশ্যক আছে। জৈব রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার যতটুকু শরীরের প্রয়োজনে লাগে বা যতটুকু বেরিয়ে যায় শরীর থেকে, শূন্যস্থান হিসেবে তা পূরণ করা দরকার। ফলে ডাবের জল নিয়মিত পান, শরীরে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের জোগান দেবে প্রয়োজনমত এবং সর্বোপরি সে-জোগান ঔষধ গলাধঃকরণ না করেই।

কিন্তু একটা কথা এখানে বলতে হবে, সব রাসায়নিক পদার্থই সকলের শরীরের অনুকূল নয়! আমাদের সকলের পরিচিত অনেকগুলি রোগ আছে, হৃদ্‌রোগ, যকৃৎ-সংক্রান্ত পীড়া, রক্তের চাপ, দুশ্চিন্তাজনিত ব্যাধি, ক্রনিক পেটের অসুখ। এইসব রোগে অনেকেই আক্রান্ত হন বা নিয়মিত ভুগে থাকেন। যাঁদের এ ধরনের অসুখ-বিসুখ হয়, তাঁদের সোডিয়ামযুক্ত পানীয় প্রয়োজন। কিন্তু সোডিয়াম-বর্জিত পানীয় পাওয়া কঠিন। অথচ শারীরিক কারণে অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ চাই-ই। এইদিক দিয়ে ডাবের জল ভাল—কচি ডাব বা ঝুনো ডাবের চেয়ে মাঝারি ডাব আদর্শ।

অবশ্য এর বিপরীত দিকও আছে। হৃদ্‌যন্ত্রের কোনো কোনো অসুখ আছে যেখানে রক্ত চলাচল কম হওয়ার জন্যে প্রস্রাব ঠিক পরিমাণে হয় না এবং শরীরে জল জমে যায়। এইসব ক্ষেত্রে জলের সঙ্গে সোডিয়ামও শরীরে জমতে থাকে। আজকাল নানারকম ওষুধ দিয়ে প্রস্রাব শরীর থেকে বের করে দেওয়া সম্ভব বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পটাশিয়ামও বেরিয়ে যায়, যেটা খুব ক্ষতিকর। এর প্রতিকার হিসেবে ডাক্তাররা অনেক সময়ে পটাশিয়াম সল্ট ওষুধ হিসেবে খেতে দেন, কিন্তু ডাবের জল তার চেয়ে অনেক ভাল বিকল্প।

স্ট্রয়ে মুখ দিয়ে আমরা যে-সব পানীয় টানি সেইসব পানীয় কি রকম? তাদের দাম তো ডাবের জলের চেয়ে বেশি। সেই জাতীয়

পানীয় শরীরের পক্ষে কতটা উপকারী ? নিঃসন্দেহে ওইসব পানীয় একটি অল্পস্থায়ী উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে। ওই ধরনের পানীয়ে সাধারণভাবে স্যাকারিন থাকে। যদি স্যাকারিনের বদলে চিনি থাকত, তাহলে তা খানিকটা শক্তির উপাদান হিসেবে কাজ করত। কিন্তু স্যাকারিন শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর।

তাহলে সব দিক মিলিয়ে দেখা যায় ডাবের জল একক এবং অদ্বিতীয়। ছোটবেলায় গ্রামের বাড়িতে পৌঁছোলে দিদিমা-দাদু যে বলতেন, নাতিকে একটা ডাব কেটে দে, তাঁরা এবং আমরা না জানলেও তার একটা তাৎপর্য আছে, ডাবের জলের কোনো বিকল্প নেই।

ভূমিকম্পের পূর্বাভাষ কি সম্ভব ?

আজ ভূমিকম্প আমাদের কাছে এক দুঃস্বপ্নের মত—আমাদের আতঙ্কিত করে তুলেছে। সম্ভবত বিপদ মাত্রেই আকস্মিক কিন্তু যে বিপদ আকস্মিক এবং যা ব্যক্তিকে অতিক্রম করে সমাজ, সংসার এবং পরিজন নিয়ে ব্যাপকতায় নির্দিষ্ট, নিঃসন্দেহে তা আমাদের কাছে মারাত্মক এবং ভয়াবহ।

ভূমিকম্প কাকে বলে ?

ভূমির যে-কোনো কম্পনই ভূমিকম্প। কিন্তু সব কম্পনকেই আমরা ভূমিকম্প বলি না। বাড়ির পাশ দিয়ে ট্রেন ছুটে চলার সময়ে দরজা-জানালা নড়ে ওঠে। খাটের পায়া কাঁপে। তেমনি রাসায়নিক পদার্থের বিস্ফোরণ হলে পারিপার্শ্বিক বিস্তীর্ণ অঞ্চল কম্পমান হয়। কিন্তু এসব কম্পন কৃত্রিম কম্পন। এদের ভূমিকম্প বলে না। ভূমির স্বাভাবিক কম্পনের নামই ভূমিকম্প।

ভূমিকম্প তিন রকমের হতে পারে ঃ গভীর, অগভীর এবং গভীরও

নয় অগভীরও নয় এমন মধ্যবর্তী পর্যায়ের ভূমিকম্প। গভীর যে ভূমিকম্প তা ঘটতে পারে ভূ-পৃষ্ঠের ৭০০ কিলোমিটার গভীরে। অগভীর ভূ-কম্পনও ৪০/৫০ কিলোমিটারের মধ্যে এবং মধ্যবর্তী পর্যায়ের ভূ-কম্পন অন্তর্বর্তী অঞ্চলে কোথাও, কোনোখানে।

সাধারণভাবে যত ভূমিকম্প আমাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়িত এদের বেশিরভাগেরই উৎপত্তি অগভীর। টেকটনিক ভূমিকম্প নামে এদের পরিচয়। পৃথিবীর অধিকাংশ ভূমিকম্প এবং সাম্প্রতিক ভূমিকম্পগুলি এই পর্যায়ভুক্ত।

ভূমিকম্প সম্পর্কে বর্তমান বিজ্ঞানের ধারণা কি? বর্তমান বিজ্ঞান বলেছে, পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠের ঠিক নীচে গ্রানাইট এবং ব্যাসল্টের যে স্তর আছে, সেগুলি প্রায় এক ডজন প্লেট সমন্বিত। এই প্লেটগুলি খুব আস্তে একটা নির্দিষ্ট দিকে সরে যাচ্ছে। সরে যাবার সময়ে অবস্থাটা কি রকম থাকে? সে-সময়ে একটি প্লেটের সঙ্গে আর একটি প্লেটের সংঘর্ষ—ফলে পীড়নশক্তির নির্গমন (Stress Energy Release)। এই যে শক্তি নির্গমন, এই শক্তি দুই ধরনের: অভিলম্ব জাতীয় পীড়ন এবং পার্শ্বিক পীড়ন। হঠাৎ কোনো জায়গায় যদি এই পীড়নশক্তি অতিরিক্ত মাত্রায় বৃদ্ধি পায়, তখনই হয় মুশকিল। তখন সেখানকার পাথর এবং শিলা চূর্ণবিচূর্ণ হয়, পারিপার্শ্বিক বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। আঞ্চলিক বিপর্যয়ের ফলে সৃষ্টি হয় প্রচণ্ড কম্পন। সে কম্পন দুটি স্থিতিস্থাপক তরঙ্গের (Elastic wave) মাধ্যমে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এর একটি প্রেসার তরঙ্গ (Pressure wave), অন্যটি কৃতন তরঙ্গ (Shear wave)। এদের গতিবেগ আলাদা। প্রেসার তরঙ্গ আসে অতি দ্রুত, কৃতন তরঙ্গ ধীরে। এই দুটি তরঙ্গের পার্থক্য থেকে আবহমন্দিরের ভূমিকম্প নির্ণায়ক যন্ত্রে ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থলের দূরত্ব নির্ণয় করা যায়।

এইতো হল ভূমিকম্পের মূল কারণ যে ভূমিকম্পের সঙ্গে আমাদের পরিচয়, অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠের ঠিক নীচে গ্রানাইট এবং ব্যাসল্টের যে-স্তর

আছে, সেই স্তরের প্লেটগুলির সরণ। সেই সরণকে অবলম্বন করে বিজ্ঞানীরা ভূমিকম্পের পূর্বাভাষ দেবার চেষ্টা করেছেন।

বিভিন্ন দেশের ভূমিকম্পের আগে দেখা গেছে, পশু-পক্ষীর আচার-আচরণের পরিবর্তন ঘটে। নিশ্চয় তাদের অতিরিক্ত সংবেদনশীলতা আছে। কিন্তু সে সংবেদনশীলতা প্লেটগুলির সরণের ক্ষেত্রে কি কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করে?

বিজ্ঞানীরা বলেছেন, ভূমিকম্প ঘটবার পূর্বে এই প্লেটগুলির সরণের গতিবেগ যায় বেড়ে। যদি প্লেটগুলির গতিবেগের পরিবর্তন সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়, তাহলে হয়তো ভূমিকম্পের পূর্বাভাষ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু প্লেটগুলির গতিবেগের পরিবর্তন নির্ণয় করা যাবে কী ভাবে?

বিজ্ঞানীরা বলেছেন, হ্যাঁ তা সম্ভব। যদি পৃথিবীর পরিপ্রেক্ষিতে স্থির (Geo-stationary) কৃত্রিম একটি উপগ্রহ মহাশূন্যে নিক্ষেপ করা যায়, তাহলে সেই কৃত্রিম উপগ্রহ অবলম্বনে সরণের গতিবেগের পরিবর্তন নির্ণয় করা যেতে পারে। যদি এই জাতীয় যোগাযোগকারী কোনো কৃত্রিম উপগ্রহকে কলকাতার আকাশে কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় দেখা যায়, তাহলে বরাবরই সে ওই নির্দিষ্ট অবস্থানেই থাকবে, কখনোই তার স্থান পরিবর্তন হবে না।

এখন আমাদের পার্থিব কোনো মানমন্দির থেকে যদি লেসার রশ্মি উপগ্রহটির উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করা যায়, তাহলে সেই লেসার রশ্মি কৃত্রিম উপগ্রহটি থেকে প্রতিফলিত হয়ে আবার মানমন্দিরে ফিরে আসতে যে সময় নেবে তা বরাবর নির্দিষ্ট থাকার কথা। এটি নিঃসন্দেহে মানমন্দির-সংক্রান্ত প্লেটের সরণ। স্বাভাবিকক্ষেত্রে এই সরণ অপরিবর্তিত থাকবে কিন্তু ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে প্লেটগুলির সরণের গতিবেগ যখন দ্রুততর হয়, তখন এই নির্দিষ্ট সময়েরও পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের নির্দেশই ভূমিকম্পের পূর্বাভাষ হিসেবে কাজ করবে।

ফাইলেরিয়া রোগ নির্ধারণের জন্যে কখন রক্তপরীক্ষা করা দরকার ?

ফাইলেরিয়া বা ম্যালেরিয়া রোগ রক্তপরীক্ষার মাধ্যমেই সঠিক-ভাবে ধরা পড়ে।

দুটি রোগই ছড়ায় মশা। তবে ম্যালেরিয়ার বাহক যেখানে অ্যানোফিলিস, সেখানে ফাইলেরিয়া রোগ ছড়াচ্ছে কিউলেক্স জাতের মশা। রোগ ছড়ানোর পদ্ধতিতে ফাইলেরিয়া এবং ম্যালেরিয়ার মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে। এইসব রোগে আক্রান্ত কাউকে দংশন করবার পরে সেই রোগ ছড়াবার অনুকূল অবস্থায় আসবার জন্যে মশাকে কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হয়। কিউলেক্স মশার ক্ষেত্রে এই সময়-সীমা দুই সপ্তাহের মত। কিন্তু দুটি রোগ নির্ণয়ে যে রক্তপরীক্ষা করা হয়, সে-রক্ত একই পরিবেশে নেওয়া হয় না। ফাইলেরিয়া রোগ নির্ণয়ে যে-রক্ত পরীক্ষার জন্য নেওয়া হয়, একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে, সে-রক্ত নেওয়া হবে মধ্যরাত্রে, অন্ধকারে, গভীর ঘুমে রোগী যখন আচ্ছন্ন থাকবে।

ভেবে দেখা যাক, অবস্থাটা একবার। মধ্যরাত্র, চারিদিক নিঃস্তব্ধ, রোগী গভীর নিদ্রামগ্ন, এমন এক সময়ে সূচীবিদ্ধ করে রক্তসংগ্রহ চলেছে রোগনির্ণয়ের জন্যে।

স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের প্রাক্তন অধিকর্তা ডঃ এ বি চৌধুরী বলেন, হ্যাঁ, রোগনির্ণয়ের জন্যে রক্তপরীক্ষার উপযুক্ত সময় মধ্যরাত্র। যে রক্তে আমরা রোগটির জীবাণু খুঁজি, দিনেরবেলায় রক্তপরীক্ষায় তাদের পাওয়া যায় না। সারাদিন তারা থাকে ফুসফুস, যকৃৎ ইত্যাদির অভ্যন্তরে অবস্থিত শিরা-উপশিরায়। তারপর রাত ৮টা বা ওইরকম

সময় থেকে তারা শরীরের প্রান্তভাগে চামড়ার নীচে শিরা-উপশিরায় চলে আসতে শুরু করে, থাকে ভোররাত্রি পর্যন্ত, মধ্যরাত্রে চূড়ান্ত পর্যায়ে। সেই সময়ে ওইসব জায়গা থেকে রক্ত নিয়ে পরীক্ষা করলে রোগটির অস্তিত্ব অবশ্যই ধরা পড়ে। তার মানে এই নয় যে অন্ধকারে, নিঃশব্দ পরিবেশে, রোগীকে নিদ্রামগ্ন থাকতে হবে। রাত যদি গভীর হয় তো রোগী নাচে গানে যে-কোনো অবস্থাতেই থাকুক, রক্তে রোগটির অস্তিত্ব পাওয়া যাবে এবং আলো জ্বালা থাকলেও কোনো অসুবিধা হবে না।

আপেল না পেয়ারা, কোন্‌টা খাব ?

আস্বাদের দিক থেকে আপেল এবং পেয়ারা কেউ কম যায় না। বরং দাঁত যদি ঠিক থাকে, নুন মিশিয়ে ডাঁসা পেয়ারা চিবোতে যে-রকম আরাম, অনেকেই বলবে, আপেল সে-রকম নয়।

কিন্তু আস্বাদের কথা যদি বাদ দিই, তাহলে? প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায়, আপেল একটি দামী এবং নিঃসন্দেহে অভিজাত খাদ্য। কাশ্মীরী ফল, বাক্সের ডালা খুলে পাতলা কাগজের আস্তরণ থেকে যখন সে সযত্নে বেরিয়ে আসে তখন নিশ্চয় তাকে লোভনীয় মনে হয়। বেশি পয়সা দিয়েও কিনবার মত। সস্তার পেয়ারা তার ধারে-কাছে আসবে কেন?

কিন্তু এ-কথা আমরা ক'জন জানি, দূরের বস্তু দামী আপেলের যে খাদ্যগুণ আমাদের ঘরের পাশে হাতের নাগালের মধ্যে দেশি পেয়ারার খাদ্যগুণ তার তুলনায় অনেক বেশি।

একটি আপেল এবং একটি পেয়ারা, দুটি ফলই আমাদের শরীরে দেবে কিছুটা প্রোটিন, কিছুটা কার্বোহাইড্রেট এবং সেই সঙ্গে ভিটামিন সি। অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থও আছে। কিন্তু তুলনায় তারা যৎসামান্য।

১০০ গ্রাম ধরে যদি হিসেব করি তাহলে প্রোটিন আছে আপেলে ০'৩ গ্রাম, পেয়ারায় ১'৫ গ্রাম; কার্বোহাইড্রেট যথাক্রমে ১৩'৪ গ্রাম ও ১৪'৫ গ্রাম এবং ভিটামিন সি ২ মিলিগ্রাম ও ২১২ মিলিগ্রাম। অর্থাৎ আপেলে যেখানে ভিটামিন সি প্রায় নেই, তুলনায় পেয়ারায় সেখানে ভিটামিন সি অনেক বেশি। কেন তবে দাম বেশি দেব অথচ শরীরের পক্ষে অপরিহার্য ভিটামিন সি থেকে বঞ্চিত হব ?

রেগুলেটার কি খরচ কমায় ?

পাখার রেগুলেটারকে ১ বা ২ পয়েনটে রাখলে হাওয়া কমে। আবার 'ফুল' পয়েনটে ঘুরিয়ে দিলে সবচেয়ে বেশি হাওয়া দেয়। এই হাওয়ার কমা-বাড়ার সঙ্গে কি বিদ্যুৎ খরচের প্রত্যক্ষ কোনো সম্পর্ক আছে ? নাকি রেগুলেটারকে ঘুরিয়ে হাওয়া কমবেশি যেমনই করি না আমরা, খরচের কোনো তফাৎ হয় না ?

পাখা যখন পুরোদমে ঘুরছে তখন রেগুলেটারে কোনো রেসিসটেন্স বা রোধ যোগ করা হয়নি। বাধা নেই, তাহলে পাখার ভেতর দিয়ে সবচেয়ে বেশি বিদ্যুৎ চলেছে, পাখা ঘুরছে যতটা জোরে সে ঘুরতে পারে আর বিদ্যুতের বিল, সেও উঠছে সর্বোচ্চ হারে। এবারে রেগুলেটারকে ১ বা ২ পয়েনটে ঘুরিয়ে পাখার গতিকে যদি কমিয়ে আনি ? ১ বা ২ পয়েনট মানে রেগুলেটারে তখন সবচেয়ে বেশি রোধ যোগ করা হয়েছে। সে-সময় পাখার ভেতর দিয়ে যে বিদ্যুৎ চলছিল, সে যাবে কমে। হাওয়াও যাবে অনেকটা ধীর হয়ে।

এখন রেগুলেটারের অবস্থাটা কী ? পাখার ভেতর দিয়ে যে বিদ্যুৎ যাচ্ছে সেটা যাচ্ছে রেগুলেটারের ভেতর দিয়েও। যখন রেগুলেটারে কোনো রোধ যোগ না করে পাখা ঘোরানো হয় তখন রেগুলেটারে রোধের কোনো কাজ নেই। রেগুলেটারে তখন হাত

দিলে কী দেখব? কোনো বাধা নেই, বিদ্যুৎ যাচ্ছে সরাসরি, ফলে রেগুলেটার তখন ঠাণ্ডা। আর যেই বাধা দেওয়া তখনই উত্তাপের সৃষ্টি। রেগুলেটার যেন একটা ছোট হিটার আর পাখা ঘুরানোর সময়ে এই হিটার হয়ে উঠছে উত্তপ্ত। কিন্তু এই হিটারের উত্তাপকে কোনোভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে না।

রেগুলেটার নেই কিম্বা রেগুলেটার ফুল-পয়েনটে রাখা হয়েছে এমন পাখায় যে-হারে বিদ্যুৎ পোড়ে, রেগুলেটারকে ১ বা ২ পয়েনটে রাখলে বিদ্যুৎ পোড়ে তার চেয়ে অনেক কম হারে। সেদিক থেকে আমাদের খরচ কমেই।

কিন্তু সে-খরচ কমার হার কতটা? রেগুলেটারকে 'ফুল' থেকে ১ পয়েনটে ঘুরিয়ে আনলে হাওয়া যতটা কমে খরচও কি কমে আসে ঠিক সেই অনুপাতে?

যখন রেগুলেটারকে ফুল পয়েনটে রেখে পাখা ঘুরছে, তখন যে বিদ্যুৎ পুড়ছে তার সবটাই খরচ হচ্ছে পাখা ঘোরাতে। সবটাই পাচ্ছি আমরা হাওয়া হিসেবে। আর রেগুলেটারকে ১ বা ২ পয়েনটে রাখবার সময়ে এমনিতে বিদ্যুৎ পোড়ে কম তবু যেটুকু পোড়ে সে-সময়ে, তার কিছুটা যাচ্ছে পাখার ভেতর দিয়ে আর বাকিটা পুড়ছে রেগুলেটারের মধ্যে। পাখার ভেতর যে বিদ্যুৎ যায়, তা দেয় হাওয়া আর রেগুলেটারের রোধে যে বিদ্যুৎ পোড়ে তা দেয় উত্তাপ—তাই রেগুলেটার তখন গরম। রেগুলেটারকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুতের খরচ কমাতে গেলে যে বিদ্যুৎটুকু যাচ্ছে রেগুলেটারকে উত্তপ্ত করার জন্যে সেইটুকু যেন আমাদের দিতে হয় কমিশন দেওয়ার মত।

রোধ বাড়িয়ে অর্থাৎ রেগুলেটারকে ১ বা ২ পয়েনটে এনে যতই আমরা বিদ্যুতের খরচ কমানোর চেষ্টা করব, ওই কমিশনের পরিমাণ ততই কিন্তু বাড়বে।

গরুকে দেওয়া ইনজেকসন কি দুধের মান কমায়?

দুধের পরিমাণ বাড়ানোর একটি সহজ এবং দাম-না-লাগা পদ্ধতির কথা আমরা এতদিন জেনে এসেছি। তা হল জল। অবশ্য এ যদি ব্যবসা উপলক্ষ্যে হয় এবং সেখানে যদি গোপনীয়তা থাকে, তা হলে যতটুকু জল, দুধের দরে ততটুকুই মূল্য আদায় করা চলে।

দুধের পরিমাণ বাড়ানোর আর একটি পদ্ধতিও আমাদের নজরে এসেছে। না, সেখানে জল নেই। জল থাকলে একদিকে ভাল, বিশেষ করে যদি তা বিশুদ্ধ জল হয়। সেখানে শুধু দুধের পরিমাণ কমে। যতটুকু জল দিয়ে ঘাটতি দুধ পূরণ করছি দুধ তরল হল ততটুকু মাত্র। কিন্তু বিকল্প যে পদ্ধতিতে দুধের পরিমাণ বাড়ানো হয়, সেখানে অবস্থাটা কি দাঁড়ায়?

আমরা এক বিজ্ঞানোন্নত যুগে বাস করছি। জল মিশিয়ে দুধে ভেজাল দেওয়ার পদ্ধতি আজ প্রায় বাতিল। দুধ ব্যবসায়ীরাও এ পদ্ধতির মধ্যে তেমন কোনো কৌলীন্য দেখছে না। এখন দেখি, গোয়ালারা দুধ দুইবার আগে গরুর পিছন দিকের পায়ে এক ধরনের ইনজেকসন দেয়। ইনজেকসনটির নাম পিটুইট্রিন ইনজেকসন। গোয়ালারা গরুকে এই ইনজেকসন দেয় দুবেলা দুধ দুইবার কয়েক মিনিট আগে। সঙ্গের সিরিঞ্জে ইনজেকসনটি ভরে নেয়, তারপর তা পিঠে বিদ্ধ করে।

এর ব্যবসায়িক ফল ভালই। পিটুইট্রিন একটি হরমোন ইনজেকসন। এতে থাকে এক ধরণের হরমোন—নাম পিটুসিন। এই ইনজেকসন দিলে গরু তার বাঁটে একটুও দুধ ধরে রাখতে পারে না।

ফলে সবটুকু দুধই গোয়ালারা নিঃশেষে দোহন করে নিতে পারে।

কিন্তু এতো গেল বাহ্য ফল, যতটুকু আমরা প্রত্যক্ষ করি। বাকি যতটুকু আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না, তার হিসেব করবে কে ?

ইনজেকসন দেওয়া গরু আর ইনজেকসন না-দেওয়া গরুর দুধের মধ্যে কোনো তফাৎ আছে কি ? পরিমাণের কথা বাদ দিলে তাদের গুণগত উৎকর্ষের কথা থেকে যায়। এইভাবে দুধ নিঃসরণ স্বাভাবিক পদ্ধতি বলা চলে না। যা কৃত্রিম, যা প্রকৃতিবিরুদ্ধ, তা ক্ষতিকর হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। তার গুণগত মান হ্রাস হতে পারে বা তারল্য আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। তা ছাড়া নিয়মিত এই ধরনের ইনজেকসনবিদ্ধ গরুর দুধপানে যদি আর কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়! যে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে আজকাল দুধের ব্যবসা চলে তাতেই অনেক গরু রোগগ্রস্ত অবস্থায় দুগ্ধ নিঃসরণ করে। তারপর নিয়মিত এই ইনজেকসন। পশু বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এতে গরুর অ্যানিমিয়া হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এবং অ্যানিমিয়া আনতে পারে টি-বি এবং অন্যান্য রোগ।

অথচ প্রতিকার বা প্রতিবিধানের কোনো পন্থা নজরে আসে না। সামান্য কয়েক পয়সার একটা ইনজেকসন, গরুকে দেওয়ার জন্যেই যা বিক্রী করা হয়, আমাদের শরীরে তা পরোক্ষভাবে নানাবিধ রোগ নিয়ে আসতে পারে। এই কথাটা এখনও কেউ তেমনভাবে ভেবে দেখছেন না।

পূজা-পার্বণে এবং লোকাচারে তিথি কথাটি শুনিনি, এমন আমরা কেউ নেই। সরস্বতী পূজা শুক্লপঞ্চমীতে অর্থাৎ শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে। বিজয়া দশমী বলতে বুঝি, বিসর্জন দশমী তিথিতে। শুধু সরস্বতী বা দুর্গাপূজা নয়, হিন্দুদের সকল ধর্মকর্ম নির্বাহ করা হয় তিথিকে অবলম্বন করে। ধর্মকর্মের সঙ্গে তিথির অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক।

তিথি কি ? তিথি কাকে বলে ?

চন্দ্র-সূর্যের অবস্থানের পার্থক্যই তিথির প্রাণ এবং তার সাহায্যেই তিথির গণনা করা হয়। চন্দ্র ও সূর্য আকাশে আবর্তন করে চলেছে। তাদের গতি সমান নয়। চন্দ্র চলেছে দ্রুত, সূর্য ধীরে। যে বৃত্তাকার পথ আবর্তনে সূর্যের সময় লাগছে এক বছর, চন্দ্র সেই পথ পরিক্রমায় সময় নিচ্ছে মাত্র ২৭ দিন। চলার গতির এই হেরফেরের জন্যে তাদের মধ্যে কৌণিক ব্যবধানের নিয়মিত পার্থক্য ঘটছে। অমাবস্যা বা পূর্ণিমায় পৃথিবীর সঙ্গে তারা থাকে এক সরলরেখায়। তখন তাদের মধ্যে কৌণিক ব্যবধান শূন্য। কিন্তু অমাবস্যা বা পূর্ণিমার পর থেকে এই ব্যবধান বাড়তে শুরু করে। চন্দ্র-সূর্যের আবর্তনের ক্ষেত্রে চন্দ্র যে মুহূর্তে সূর্য থেকে ১২ অংশ বা ডিগরি অগ্রসর হয়, সেই মুহূর্তেই প্রতিপদ তিথি পূর্ণতা পায়। এইভাবে ২৪ অংশ অগ্রসর হলে দ্বিতীয়া তিথি, ৩৬ অংশে তৃতীয়া তিথি ও অনুরূপভাবে অন্যান্য তিথিগুলি ১২-এর গুণিতক হিসেবে নির্দিষ্ট। তিথি হয় কৃষ্ণপক্ষের না হলে শুক্ল-পক্ষের। পূর্ণিমার পর থেকে যে তিথিগুলির সূচনা তা কৃষ্ণপক্ষের তিথি আর অমাবস্যার পরের তিথিগুলি শুক্লপক্ষের।

আমরা যে-সব পঞ্জিকা ব্যবহার করি তাদের সবগুলিতেই রবি ও চন্দ্রের সূক্ষ্ম অবস্থান দেওয়া উচিত। নতুবা এক-এক পঞ্জিকায় তিথির নির্দেশে পার্থক্য নজরে আসবে।

কোন্ ভেজাল পক্ষাঘাত আনে?

সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসে খাদ্যে ভেজালের সঙ্গে ব্যাপক পক্ষাঘাতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ্য করা গেছে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে। রোগের লক্ষণ হিসেবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিম্নাঙ্গ অবশ বা দুর্বল বোধ হয়। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে হাতের মাংসপেশীর ক্ষয় বা অসহায়তাও অনেক সময়ে ধরা পড়ে। রোগের উল্লেখে পশ্চিমবাংলার তিনটি জায়গার নাম অনেকেরই মনে পড়বে। এই তিনটি জায়গা হল, মালদহ, কাঁকিনাড়া এবং কলকাতার উত্তর শহরতলী অঞ্চল ও দমদম। ১৯৬৮ সালে মার্চ মাসে ২৪ পরগণার কাঁকিনাড়ায় এই পক্ষাঘাতজনিত রোগের প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তার পূর্বে মালদহে, ১৯৬২ সালে—সেখানে এটি মালদহ পক্ষাঘাত নামে পরিচয় লাভ করে। এবং কিছুদিন আগে কলকাতার উত্তর শহরতলী অঞ্চলে পক্ষাঘাত-জনিত রোগের যে মর্মান্তিক পরিণতি ঘটে তাতে আমরা এখনও উদ্বেগ বোধ করি।

শুধু পশ্চিমবাংলার কথা নয়, ভারতবর্ষের একাধিক শহরে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ভেজাল গ্রহণে পক্ষাঘাতজনিত এই ব্যাধিতে অনেকেই আক্রান্ত হয়েছেন। কোথাও কোথাও সে আক্রমণ অত্যন্ত ব্যাপক এবং মারাত্মক।

খাদ্যে বা তেলে যে ভেজাল গ্রহণে এই রোগটি বা রোগের লক্ষণ ধরা পড়ে তা হল Tricresyl phosphate। ভেজালে এই পদার্থটি গ্রহণে জীবনে মর্মান্তিক পরিণতি নিয়ে আসে। পরিমাণে মাত্রাতিরিক্ত দেওয়া না হলে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া কিছু নেই। তিন-চার সপ্তাহ অতিবাহিত হবে স্বাভাবিক এবং সম্পূর্ণ সুস্থভাবেই। তারপর পক্ষাঘাতের লক্ষণ পরিস্ফুট হবে অত্যন্ত আকস্মিকতায়। কিন্তু সে-

ক্ষেত্রে ভেজাল গ্রহণের পর এত দীর্ঘ সময় কেটে যায় যে, রোগের মূল কারণ নির্ণয় করা তখন স্বভাবতই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

ভেজাল পদার্থটিতে তিন জাতীয় ফসফেটের সংমিশ্রণ আছে। এর মধ্যে Triorthocresyl phosphate সবচেয়ে মারাত্মক। এটি সাধারণভাবে বর্ণহীন, তৈলাক্ত এবং জলে দ্রবণীয় নয়। কিন্তু জৈব দ্রাবকে দ্রবণীয়। প্রধানত প্লাস্টিক শিল্পে এবং চর্বি জাতীয় কোনো কোনো তেলের প্রস্তুতিতেই এর ব্যবহার।

পক্ষাঘাতজনিত রোগটি সেই কারণেই Tricresyl phosphate-এর ব্যবহার আছে এমন শিল্পসমৃদ্ধ নগরীতে দেখা দেওয়ার আশঙ্কা। পদার্থটি রক্ষণের আধার যখন তেলের আধার হিসেবেও ব্যবহৃত হয় কিম্বা যে-কোনো গ্রহণীয় খাদ্যের সঙ্গে যখন ওই পদার্থটির সংমিশ্রণ ঘটে তখনই বিপদ দেখা দেয় এবং মারাত্মক পরিণতি ঘনিয়ে আসে। রোগটির পুনরাক্রমণ যদি হয়, তাহলে নিশ্চয়ই তা সকলের পক্ষেই দুর্ভাগ্যের কথা। কিন্তু দ্বাররুদ্ধ করব কি করে? সংশ্লিষ্ট যাঁরা, তাঁরা যদি এর গুরুত্ব এবং পরিণতি অনুধাবন করতে পারেন, তবেই জনসাধারণ এই রোগের আক্রমণ থেকে নিষ্কৃতি পান।

লোডশেডিং কাকে বলে?

লোডশেডিং—এই কথাটির সঙ্গে আমাদের সকলেরই ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে।

এ-কথা ঠিক যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এবং শিল্পে বিদ্যুতের ব্যবহার ক্রমাগত উর্ধ্বমুখীন। এই উর্ধ্বমুখীন ব্যবহার মেটানোর জন্যে বিভিন্ন স্থান থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি আসার কথা পশ্চিমবাংলায়। এদের মধ্যে আছে মেটিয়াবুরুজ, মূলাজোড়, কাশীপুর, ব্যাণ্ডেল, দুর্গাপুর, সাঁওতালডিহি এবং ডি-ভি-সি প্রকল্পের অন্যান্য কেন্দ্র। সব যদি

সমানুপাতে থাকত তাহলে অসময়ে আলো নিভত না এবং প্রয়োজনমত ফ্যান চলত, হিটার জ্বলত। কিন্তু নানা কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদন কোথাও ব্যাহত হলে চাহিদার তুলনায় জোগান সমান থাকে না, ফলে কোনো না কোনো জায়গায় বিদ্যুতের ব্যবহার কমানো অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। তখন জনসাধারণকে অনুরোধ—বিদ্যুতের ব্যবহার কমাও। নইলে বিদ্যুতের সরবরাহ এক এক সময়ে এক এক অঞ্চলে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই হল লোডশেডিং।

লোডশেডিং-এর একটা উল্লেখযোগ্য কারণ যন্ত্রপাতির মেরামত এবং সংস্কারের অভাব। যেমন বিদেশী টারবাইনের কথা। সে টারবাইন নষ্ট হয়ে গেলে সেগুলি আবার আমদানীর প্রয়োজন। তখন বিদেশী মুদ্রার উপরে নির্ভরতা। কয়লার উৎপাদন, সরবরাহ ব্যবস্থা এবং মানের অবনতি ঘটলেও উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমাণ হ্রাস পায়। কারণ কয়লাকে পুড়িয়েই তাপ এবং সেই উৎপন্ন তাপের সাহায্যে জল থেকে উচ্চচাপে বাষ্পীকরণ চলে। এই বাষ্পের চাপেই টারবাইনকে চালানো হয়। এবং টারবাইনের সঙ্গেই যুক্ত থাকে জেনারেটর। আর যেখানে জল থেকে বিদ্যুৎ তৈরি করা হয়, সেখানে জলের স্রোতের সাহায্যে টারবাইন ঘোরে। ফলে তখন জলের উপরে নির্ভরতা। তাই কোনো বছর যদি আশানুরূপ বৃষ্টি না হয়, জলের পরিমাণ কমে এবং সেই সঙ্গে বিদ্যুতের পরিমাণও। লোডশেডিং-এর কারণ হিসেবে প্রাকৃতিক এবং যান্ত্রিক দিকের সঙ্গে আরও একটি দিক আছে—তা হচ্ছে মানবিক। সে-দিকটিও উপেক্ষা করবার মত নয়।

সাম্প্রতিক কালে পশ্চিমবঙ্গে মোটামুটি সবক'টি কারণের জন্যেই বিদ্যুৎ সরবরাহ কম হচ্ছে। অথচ শিল্প এবং কৃষি ব্যবস্থায় বিদ্যুতের ব্যবহার যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ফলে আমাদের প্রয়োজনমত বিদ্যুতের সরবরাহ নেই। সে-কারণেই বিদ্যুৎ রেশনিং।

বর্তমানে পশ্চিম ভারতে পরিমাণু শক্তির সাহায্যে বিদ্যুতের ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে। তারাপুরে অ্যাটমিক পাওয়ার প্রজেক্ট আছে।

তারপর রাজস্থানে রাণাপ্রতাপ সাগরকেন্দ্র; এ ছাড়াও প্রায় সম্পূর্ণ ভারতীয় বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টায় মাদ্রাজ অ্যাটমিক পাওয়ার প্রজেক্ট ; ভারতবর্ষের সব অঞ্চলেই অ্যাটমিক পাওয়ার প্রকল্প হয় হচ্ছে, না হয় হয়েছে। পূর্বাঞ্চল ব্যতিক্রম থাকবে কেন ? ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলেও এ-রকম অ্যাটমিক পাওয়ার প্রজেক্ট হওয়া উচিত কিনা এ নিয়েও অনেকেই চিন্তা করছেন।

যে-কোনো পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে প্রাথমিক পুঁজির পরিমাণ কয়লার তুলনায় অনেক বেশি। অবশ্য যদি প্রকল্পটি বৃহৎ হয়, তাহলে বিদ্যুৎশক্তি তুল্যমূল্যে এমনকি কম মূল্যেও তৈরি সম্ভব। কিন্তু যে-কোনো প্রকল্পের পরিকল্পনা, তার অনুমোদন এবং বাস্তব রূপায়ণ যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতেও আমাদের কয়লার উপরেই নির্ভর করা ছাড়া আর তো কোনো উপায় দেখি না। ফলে রাতে মশা, দিনে মাছি এবং চব্বিশ ঘণ্টা লোডশেডিং নিয়ে শুধু এই কলকাতা শহরে নয়, পশ্চিমবাংলায় আমরা বেঁচে আছি।

বিদেশীরা কলকাতার জল খায় না কেন ?

কথাটা প্রথম শুনেছিলাম এক পরিচিত ব্যক্তির মুখে। বছর কয়েক আগে তিনি বিশেষ কোনো দরকারে গিয়েছিলেন পশ্চিম জারমানির কনস্যুলেট জেনারেলের কলকাতার অফিসে। গরমের দিন। পরিচিত ব্যক্তি ভীষণ তৃষ্ণার্ত। কনস্যুলেট অফিসে জল চাইতেই ওদের জবাব ; নো ওয়াটার ; প্লিজ টেক কফি আর কোক। তাঁকে কোক দিয়েই তৃষ্ণা মেটাতে হয়েছিল।

ঘটনাটা শুনেই কৌতূহলী হয়েছিলাম। গ্রীষ্মপ্রধান এলাকায় আমাদের কলকাতা। এখানে সব অফিসেই পানীয় জলের ব্যবস্থা

থাকে। কিন্তু ওদের অফিস এক ব্যতিক্রম। কেন? শুধু কি ওদের ওখানেই? অন্য দূতাবাসেই বা অবস্থাটা কী? কৌতূহল মেটাতে গিয়েছিলাম চৌরঙ্গি রোডের আমেরিকান ইনফরমেশন সেণ্টারে। ওদের অফিসে জল আছে। কিন্তু—কিন্তু তা 'বয়েল্ড অ্যাণ্ড ফিলটার্ড'; ফোটানো ও পরিশ্রুত পানীয় জল।

একটা কথা স্পষ্ট হল। কলকাতা করপোরেশন যে পানীয় জল সরবরাহ করে, বিদেশীরা তা নির্দ্বিধায় পান করেন না; পারতপক্ষে বিকল্প পানীয়ে তুষ্ট থাকার চেষ্টা করেন। কিন্তু কেন?

আমরা যারা মারী নিয়ে ঘর করি তাদের কথা আলাদা, কিন্তু যে সব বিদেশী এই শহরে বাস করেন তাঁরা কেন এই শহরের জল খেতে আশঙ্কা বোধ করেন?

তাহলে এ প্রশ্ন সঙ্গত কারণেই করা চলে, পানীয় জল এই নাম দিয়ে করপোরেশন যে-জল পাঠাচ্ছে আমাদের বাড়ি বাড়ি, তা কতটা বিশুদ্ধ এবং পানের যোগ্য? এক গেলাস পানীয় জল হাতে নিয়ে যদি দেখি, তাতে ভেসে বেড়ানো ময়লা কিছু নেই, সে স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার, তা হলেই কি বলতে পারি, হ্যাঁ, সে-জল পানের উপযুক্ত এবং আদর্শ?

না, তা কখনো নয়। পৃথিবীর সকল বস্তুর ক্ষেত্রেই আদর্শের একটা মাপকাঠি আছে। পানীয় জলের বেলাতেও তার ব্যতিক্রম নেই। যদি এমন হত, পানীয় জল গবেষণাগারে তৈরি হয়ে চলে আসছে বাড়ি বাড়ি তাহলে তার বিচার হত চুলচেরা। সেখানে কোনোরকম শৈথিল্য নয়। যে-সব রাসায়নিক পদার্থ সামান্য পরিমাণে থাকলেও তেমন কোনো ক্ষতি হয় না তাদের একেবারে বাদ দেওয়া হত। কিন্তু পরিস্থিতি তা তো নয়। দুই তীরের বিভিন্ন কারখানার ময়লা কুড়োনো হুগলী নদীর যে-জল পলতায় পরিশ্রুত হয়ে জমা হচ্ছে টালার ট্যাঙ্কে, সেখান থেকে বাড়ি বাড়ি, সেই জলে যে নানাবিধ রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণ থাকতে পারে তাতে আর সন্দেহ কি?

কিন্তু যা দেখা দরকার, তা হল এই যে, স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে এই রাসায়নিক পদার্থগুলির কোনো কোনোটি যেন একটি নির্দিষ্ট মাত্রাকে কখনোই না ছাড়িয়ে যায়।

জলে কি থাকে? সেখানে শুধু ভাসমান কঠিন পদার্থ থাকে তা নয়, কঠিন পদার্থের সঙ্গে থাকে উদ্বায়ী দ্রবীভূত বিভিন্ন পদার্থ। ভাসমান যে-সব পদার্থ ফিল্টার বেডের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে চলে আসে, জল ঘোলা দেখায় তাদের জন্যেই। বিশেষ করে বর্ষাকালে। এ-সব আসছে অদ্রবীভূত মাটি বা জীবাশ্মের জন্যে। সাধারণভাবে করপোরেশনের পলতাতে ফিল্টার করা জলে এই ভাসমান দ্রব্য ১০ লক্ষ ভাগে ৭২০ ভাগের মত। আর যা অদ্রবীভূত তার মধ্যেই আছে বাকি সব কিছু। বর্ষায় করপোরেশনের জলে ভাসমান দ্রব্য যখন ১০ লক্ষ ভাগে ৭২০ তখন দ্রবীভূত সব কিছুর পরিমাণ ৮৫০ ভাগের মত। এই দ্রবীভূত বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে পাওয়া যায় সালফেট, ক্লোরাইড, নাইট্রেট, অ্যামোনিয়া এবং জৈব নাইট্রোজেন। তা ছাড়া থাকে লোহা, কলোয়ডাল সিলিকা এবং মুক্ত ক্লোরিন।

জলে এরা কতটা পরিমাণ পর্যন্ত থাকতে পারে? সালফেট ১০ লক্ষ ভাগে ২৫০ ভাগের বেশি থাকা উচিত নয়। তাতে শারীরিক অস্বস্তির আশঙ্কা থাকে এবং পেটের গোলমাল হতে পারে। ক্লোরাইড ৫০০—ক্লোরাইডের উপরেই জলের স্বাদ প্রধানত নির্ভর করে। ১০ লক্ষ ভাগের ক্লোরাইডের পরিমাণ যখন ৫০০কে ছাড়িয়ে যায় তখন জলের স্বাদ নোনতা লাগে। জল সব থেকে সুস্বাদু মনে হয় যখন ক্লোরাইডের পরিমাণ থাকে ৫০ থেকে ১০০-এর মধ্যে। ৫০-এর নীচে নামলেও জলের স্বাদ আবার খারাপ। বাকি যে-সব রাসায়নিক পদার্থ জলে কখনো কখনো পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে নাইট্রেট, নাইট্রাইট, অ্যামোনিয়া এবং জৈব নাইট্রোজেন জলে না থাকাটাই ভাল। কেন? কারণ কোনো জলে এরা আছে মানেই মলমূত্র, জীবদেহে পচনজনিত পদার্থ বা কলকারখানার আবর্জনা সেই জলে মিশেছে বুঝতে হবে।

তাই পানীয় জল সরবরাহের জন্যে যখনই জলের উৎসের খোঁজ করা হয়, তখনই এই দিকটি সম্পর্কে খোঁজ-খবর করা বিশেষ প্রয়োজন। তা ছাড়া আর একটি কথাও বলতে হবে। সেটি এই যে, সাধারণভাবে যে-সব প্রক্রিয়ার সাহায্যে জল শোধন করা হয়, তাদের কোনোটির দ্বারাই এদের পুরোপুরি সরানো সম্ভব নয়। তা হলে জলের উৎসটি হওয়া উচিত এইসব রাসায়নিক বিমুক্ত। কিন্তু করপোরেশনের জল তো আসছে হুগলী থেকে। তাতে কি নেই ? নানা ধরনের শিল্পের বহুবিধ আবর্জনা হুগলীর জলকে আজ যে-ভাবে দূষিত করে তুলেছে তাতে সকলেরই চিন্তার কারণ আছে। তা ছাড়া হুগলী গৃহস্থের আবর্জনা ফেলার ক্ষেত্র হিসেবেও নিত্য ব্যবহৃত হচ্ছে, সেই সঙ্গে গৃহস্থের খিড়কির পুকুর হিসেবেও।

পানীয় জলে লৌহ এবং কলোয়ডাল সিলিকা কখনো কখনো ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি ধাতুর সঙ্গে এসে যায়। ১০ লক্ষের হিসেবে এদের পরিমাণ ৫ থেকে ১০-এর বেশি হওয়া উচিত নয়। যদি বেশি হয় তো ওই জলে কাপড় কেচে শুকোতে দিলে তাতে একটা হলদেটে ছোপ পড়ে যায়। হজমের পক্ষেও এ-জল সহায়ক নয়।

জল সম্পর্কে সকলের কাছেই পরিচিত আর একটি দিক আছে। সেটি তার কাঠিন্যের দিক। এই কাঠিন্যও আবার দু-জাতের, অস্থায়ী আর বরাবর স্থায়ী। জল ফুটোলে চলে যায় যে কাঠিন্য, তাকে বলা হয় অস্থায়ী কাঠিন্য। অস্থায়ী কাঠিন্যের লক্ষণ কি ? জল ভাল করে ফুটিয়ে ঠাণ্ডা হতে দিলে জলের উপরে একটা গাদ পড়তে দেখা যায়। এই গাদ পড়ে অস্থায়ী কাঠিন্যের জন্যে। আর যা অস্থায়ী নয় তাই-ই স্থায়ী। অস্থায়ী আর স্থায়ী মিলে যখন দেখা যায় যে, ১০ লক্ষ ভাগে তা ৩০০-কে ছাড়িয়ে গেছে তখনই হয় মুশকিল। সে-সময়ে ডাল ভাল সেদ্ধ হতে চায় না।

আমাদের করপোরেশনের জলে কোন্ রাসায়নিক পদার্থ কতটা পরিমাণে আছে ? বর্ষায় করপোরেশনের জল বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে

যে, সালফেট এবং ক্লোরাইডের মাত্রা সে-জলে সামান্য, নামমাত্র, ১০ লক্ষ ভাগে মাত্র ৬ ভাগের মত। গ্রাহ্য মাত্রার চেয়ে এ অনেক নীচে, ফলে এতে বিপদের কোনো আশঙ্কা নেই।

নাইট্রেট ও নাইট্রাইট জলে না থাকলেই ভাল কিন্তু করপোরেশনের জলে তা আছে। না থেকে যাবে কোথায়? এদের তাড়ানো তো সহজ কথা নয়। সামান্য পরিমাণে হলেও ১০ লক্ষ ভাগে নাইট্রেট ও নাইট্রাইট যথাক্রমে '১৬ এবং '০০২৫। মুক্ত অ্যামোনিয়া আছে ১০ লক্ষ ভাগে '০৩ পরিমাণে। লোহার যে মাত্রা দেখা যায়, তা ১০ লক্ষ ভাগে ৫ ভাগ অর্থাৎ ক্ষতিকর নয় এবং গ্রহণ করা যায়। আর যেটি বাকি রইল তা হল কলোয়ডাল সিলিকা—তার হিসেব করপোরেশন রাখে না।

আর করপোরেশনের জলের কাঠিন্য? বর্ষার সময়ে করপোরেশনের জলে অস্থায়ী কাঠিন্য ১০ লক্ষ ভাগে ৭৪ ভাগের মত এবং স্থায়ী কাঠিন্য মাত্র ৬ ভাগ অর্থাৎ সর্বমোট ৮০ ভাগ। নিঃসন্দেহে এ সামান্য।

যে বর্ষায় করপোরেশনের পানীয় জল আরও অজস্র দূষিত পদার্থের সংমিশ্রণে মানের দিক থেকে নিম্ন পর্যায়ের হওয়া উচিত, যদি করপোরেশনের খাতায় রাখা তথ্য ঠিক হয়, তাহলে বলতে হবে, আজও সে ততটা নিম্নমানের বলে চিহ্নিত হবার পর্যায়ে নেমে আসেনি। সম্ভবত ফরাক্কার জল এসে অবস্থার কিছুটা উন্নতি করেছে।

করপোরেশনের জলের আলোচনায় আর একটি দিকের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। সেটি ব্যাক্টেরিয়া-সংক্রান্ত। এই জলে কি ব্যাক্টেরিয়া আছে?

ফিল্টার হওয়ার আগের কাঁচা জলে অজস্র ব্যাক্টেরিয়া দেখা যায়। বর্ষার সময়ে এই ব্যাক্টেরিয়া সংখ্যার হিসেবে ১০০ সিসি-তে ১৬০০০ থেকে ২৪০০০-এর মত। অর্থাৎ হুগলীর প্রবহমান জলের এই অবস্থা। কিন্তু বর্ষার পর বা বর্ষা নামার আগে গ্রীষ্মের সময়ে এই সংখ্যা অনেক কমে আসে। তখন ১০০ সিসি-তে প্রায় ৬০০০।

অবশ্য কাঁচা জলে ব্যাক্টেরিয়ার সংখ্যা যাই থাকুক, ক্লোরিন দেওয়ার পরে করপোরেশনের অভিমত, এই জল পুরোপুরি ব্যাক্টেরিয়া বিমুক্ত অবস্থায় এসে যায়।

আজকাল অবশ্য করপোরেশন কলকাতা জুড়ে যে-জল সরবরাহ করে তার সবটাই টালার ট্যাঙ্ক থেকে আসে না। এখন কলকাতা হল মহানগরী—সেই মহানগরীকে পুরোপুরি জল সরবরাহ করার সাধ্য টালার নেই। কলকাতা জল পায় অনেক জায়গায় ডিপ টিউবওয়েল থেকে। ডিপ টিউবওয়েলের জল তো ফিল্টার করা জল—সে ফিল্টার করে আমাদের ধরিত্রীর বিভিন্ন স্তর। এই জল করপোরেশনের জলের তুলনায় উন্নতমানের হওয়ার কথা।

টালারই হোক বা ডিপ টিউবওয়েলেরই হোক জলের আধারে গেলাস ডুবিয়ে তো আমরা জল খাচ্ছি না। জল আসছে পাইপের ভিতর দিয়ে, যে পাইপ বহু পুরানো, বহু ছিদ্রযুক্ত। ফলে অজস্র দূষিত পদার্থের সংমিশ্রণে খাতায় লেখা জলের সঙ্গে সেই জলের গুণাগুণের অনেক পার্থক্যই থাকবে, এ স্বাভাবিক। সে-দিক দিয়ে নিঃসন্দেহে জল আরও দূষিত হয়ে উঠবে।

এই আরও দূষিত হয়ে ওঠা জল করপোরেশনের পানীয় হিসেবে চিহ্নিত জল। অথচ যে-জল পানীয়, সে-জল শতকরা ১০০ ভাগই পানের যোগ্য বা বিশুদ্ধ হওয়া উচিত।

কেন অনভ্যস্ত লোক এই শহরের, এই করপোরেশনের জল খেতে চাইবেন না, ভয় পাবেন, কেন বিদেশীরা 'বয়েল্ড এন্ড ফিল্টার্ড' ওয়াটারের খোঁজ করবেন ; কেন চিকিৎসকেরা শিশুদের এবং অসুস্থদের ফোটানো জল খাওয়ানোর কথা বলবেন ?

বিজ্ঞানোন্নত যুগে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে সকলের আগে চাই বিশুদ্ধ পানীয় জল। এই কলকাতা মহানগরী যে 'পানীয় জল' আমাদের বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছে তা যদি যথেষ্ট পানীয় না হয় তাহলে আমাদেরও ফোটানো জলের উপরে নির্ভর করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প থাকে না।

কোলাহল কি ক্ষতি করে ?

শব্দ যে এক ব্রহ্মাস্ত্র প্রাত্যহিক জীবনে যাঁরা দীর্ঘক্ষণ কোলাহলের মধ্যে কাজ করেন, একদিন তাঁরা সে-কথা নিশ্চয় বুঝতে পারবেন।

বলতে গেলে, কে নয় ? আজকাল শহরে গঞ্জে লোকসংখ্যা দিনের পর দিন যেভাবে বেড়ে চলেছে, কলকারখানা যে পরিমাণে বিস্তার লাভ করছে, যানবাহন যে হারে উর্ধ্বগতিপ্রাপ্ত হচ্ছে, তাতে কোলাহল তো বারণ হল, এমন নিষিদ্ধ নগরীতে ধ্যান-গম্ভীর পরিবেশে কোন্ ভাগ্যবান থাকবার সুযোগ পাবেন ?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কোলাহলের মাত্রা এক অবিশ্বাস্য হারে বেড়ে চলেছে। শুধু যদি গত ২০ বা ২৫ বছরের হিসেব নেওয়া যায়, তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, নগরজীবনেই কোলাহলের মাত্রা হয়তো দ্বিগুণেরও বেশি বর্ধিত হয়েছে।

এতদিন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা এ বিষয়টির দিকে তেমনভাবে দৃষ্টি দেন-নি। তাঁদের একটা ধারণা ছিল যে, প্রাত্যহিক জীবনে যত শব্দ আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, তারা ততটা ক্ষতিকর নয়। কিন্তু সাম্প্রতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল ভিন্ন। সেখানে দেখা গিয়েছে, শব্দের যে মাত্রায় শ্রবণযন্ত্রের অনিষ্ট হয় বলে বিজ্ঞানীরা মনে করতেন, তার চেয়ে অনেক কম শব্দ সৃষ্টি হলেই আমাদের শ্রবণযন্ত্রের ক্ষতি হতে পারে। প্রাত্যহিক জীবনে শব্দ এই মাত্রায় বহুবারই উন্নীত হয়।

যে-কোনো কিছুরই হিসেব-নিকেশের একটা একক থাকে। দৈর্ঘ্যের মিটার, ওজনের গ্রাম, সময়ের সেকেণ্ড, সেরকম শব্দকেও পরিমাপ করার একক আছে। শব্দ যখন উৎপন্ন হয়, তখন যে চাপের সৃষ্টি হয়, বিজ্ঞানীরা শব্দকে পরিমাপ করেন সেই চাপের সাহায্যে। এই সৃষ্ট চাপের এককের নাম ডেসিব্‌ল্।

আজ বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন যে, নগরজীবনে কোলাহলের মাত্রা প্রতি বছরই আধ ডেসিব্ল্-এর মত বেড়ে চলেছে। লোকসংখ্যা এবং সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এ ঘটবেই। শব্দের এ তরঙ্গ রোধে সাধ্য কার ?

শ্রবণ চিকিৎসাবিদেরা শব্দের মাত্রা ডেসিব্ল্-এর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন খুব সহজে, আমাদের নিত্য পরিচিত আলাপের বিভিন্ন চিত্রের মাধ্যমে। পারিপার্শ্বিকে কত ডেসিব্ল্ পর্যন্ত গোলমালে একের কথা অন্যকে শোনাতে অসুবিধা হয় না বা গোলমালের মাত্রা কত ডেসিব্ল্ পর্যন্ত চড়লে চীৎকার না করলে চলে না কিম্বা কত ডেসিব্ল্-এ চীৎকার করলেও কথাবার্তা চালানো দুঃসাধ্য মনে হয় ?

গভীর রাত্তিরে পারিপার্শ্বিক যখন নিঃশব্দ, যখন ফিসফাস আলাপে ২০ ডেসিব্ল্ যথেষ্ট। কিন্তু ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক-এর মত চার-পাশের কোলাহল যখন ৪৫ থেকে ৬০ ডেসিব্ল্-এর মধ্যে ওঠানামা করে তখন খানিকটা অসুবিধা হয় বৈকি। আর চারধারের গোলমাল যখন ৬৫ ডেসিব্ল্-এর উপরে তখন আমার বক্তব্য শোনাতে গেলে চীৎকার না করে কোনো উপায় নেই। কিন্তু কোলাহলের মাত্রা যখন আরও উপরে উঠতে থাকে, তখন শুনতে বা শোনাতে সত্যিই অসুবিধা হয়। ৭০ ডেসিব্ল্ থেকে শুরু, কিছুটা বাড়ে ৮০ থেকে ৯০-এ এবং তারপরের অবস্থা কল্পনার বাইরে।

ডেসিব্ল্-কে আর একটু সুস্পষ্ট করে তোলার জন্যে ঘুমের সময়ের কথাও বলা যাক। ঘুমের সময় অবশ্য অবস্থাটা অন্য রকমের। ঘুমের উদ্যোগ করছেন, তখন যদি ৩৫ থেকে ৪০ ডেসিব্ল্ মাত্রায় কোলাহল চলে তাহলে তা একটু অসুবিধাজনক হবে নিশ্চয়। এবং ৫০ থেকে ৭০ ডেসিব্ল্ মানে বেশ হৈ-হট্টগোল বুঝতে হবে, তখন ঘুম হওয়া কঠিন।

বিভিন্ন দেশে শব্দ বা কোলাহল নিয়ন্ত্রণ নিয়ে যে চিন্তা-ভাবনা তা

মূলত বিমানের ওঠা-নামাকে কেন্দ্র করে। কনকর্ডে নামে নতুন যে ফরাসী সুপারসনিক জেট বিমান চালু হয়েছে তার শব্দ অসহনীয় রকমের বেশি। ১০০ ডেসিব্‌ল্‌-এর চেয়েও এটি জোরালো মাত্রার শব্দ সৃষ্টি করে এবং তা প্রায় ৫৪ বর্গমাইল জায়গা জুড়ে শোনা যায়। সেভেন-ফোর-সেভেন জামবো জেটের সাম্প্রতিক এক মডেলেও ১০০ বা তার চেয়ে বেশি ডেসিব্‌ল্‌-এর শব্দ সৃষ্টি হয়, তবে সে-শব্দ ৫৪ বর্গমাইল জায়গা জুড়ে পরিব্যাপ্ত নয়। শব্দবিদ্‌দের অভিমত, মাত্র ৩ বর্গমাইলেই সে সীমাবদ্ধ থাকে।

কিন্তু বিমানবন্দরে বিমানের ওঠা-নামায় যে শব্দের সৃষ্টি তার সঙ্গে তো নগরজীবনের প্রাত্যহিক বিবিধ শব্দের সম্পর্ক নেই। বিমানবন্দর থাকে শহরের অনেক বাইরে, লোকালয় পার হয়ে বিস্তীর্ণ এক অঞ্চল জুড়ে। ফলে বিমানবন্দরের বিমানের শব্দের সঙ্গে সন্নিহিত অঞ্চল-বাসিদের সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু নগরজীবনের সঙ্গে তার তেমন সম্পর্ক কোথায়?

সম্পর্ক নাই থাকুক, নগরজীবনে যে-সব শব্দ আমাদের নিত্য বিব্রত করে তা কোনো অংশেই বিমানের ওঠা-নামার অসহনীয় শব্দের চেয়ে কম নয়। আমাদের বারো মাসে তের পার্বণ, আজ সে-সংখ্যা আরও বেড়েছে। যে-কোনো পূজায়, যে-কোনো অনুষ্ঠানে, যে-কোনো আচারে মঙ্গলঘট এবং বিবিধ উপাচারের সঙ্গে মাইক—এবং তা চূড়ান্ত উচ্চৈঃস্বরে—অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। শহরের যে-কোনো ছোট পাড়াতেই বছরে এমন ক'টা দিন যায়, যেদিন গৃহপ্রবেশ, অন্নপ্রাশন, দ্বারোদ্ঘাটন, উপনয়ন, শুভবিবাহ বা পূজাকর্ম পালিত হয় না? এবং এদের প্রতিটিতেই মাইক অবশ্য অঙ্গ। এই মাইকের শব্দ যে চাপ সৃষ্টি করে, তা কত ডেসিব্‌ল্‌-এ উন্নীত হয়, কনকর্ডের সে কত কাছাকাছি, সেভেন-ফোর-সেভেন জামবো জেটের সঙ্গে তার শব্দের মাত্রার পার্থক্য কত, এ নিয়ে কোনো পরিসংখ্যান বা কোনো হিসেব আছে কি?

হিসেব না থাক, তবু তারতম্য তেমন হওয়ার কথা নয়।

শুধু তো মাইক নয়, বাড়ির পাশের সদর রাস্তা দিয়ে মাল-বোঝাই ভারি লরি ছুটে চলছে কর্কশ, অমসৃণ শব্দ তুলে। সহস্র মানুষের মিছিল চলেছে রবে প্রতিরবে আকাশ বাতাস উচ্চকিত করে, সকাল ন'টায় নিয়মিত সাইরেন, এইসব বিচিত্র ধ্বনি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনকে যে অবিরত শশব্যস্ত করে তোলে, এ-কথা অস্বীকার করবে কে ?

অথচ এই কোলাহল এবং শব্দের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে আমরা এখনও সচেতন হইনি। এ যে শুধু নগরজীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে মলিন করে তা নয়, নানাবিধ শারীরিক এবং মানসিক ক্ষতিরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়! কোলাহল থেকে আসে অনিদ্রা—এ-কথা আজ সকলেই জানেন। তা ছাড়া খিটখিটে ভাব এবং বদমেজাজও এই কোলাহলের জন্যে এসে থাকে। আজ চিকিৎসক-সমাজ বলছেন, অনিদ্রা এবং বদমেজাজ ছাড়াও শারীরিক ও মানসিক আরও অনেক-গুলি উপসর্গ দেখা যায় কোলাহলের জন্যে। তাঁদের অভিমত, দুশ্চিন্তা যেমন আমাদের স্নায়বিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, শব্দব্রহ্মও সে-রকম। কোনো কোনো কর্ণচিকিৎসক অবশ্য এমন কথাও মনে করেন যে, উচ্চ মাত্রার শব্দের মধ্যে থাকলে হৃদ্‌যন্ত্রেরও গোলমাল হতে পারে। কিন্তু আয়ু? দীর্ঘকাল উচ্চ মাত্রার শব্দের মধ্যে অতিবাহিত করলে কি আয়ু কমে আসারও আশঙ্কা থাকে ? এ-বিষয়ে হ্যাঁ বা না কোনো সিদ্ধান্তেই বিজ্ঞানীরা আসতে পারেননি। তবে যদি দুশ্চিন্তা আমাদের আয়ুকে হ্রাস করে এবং কোলাহল যদি দুশ্চিন্তা নিয়ে আসে, তবে কেন তা থেকে আমাদের আয়ু হ্রাস পাবে না ?

আজ শব্দের এই প্রভাব থেকে মুক্তির জন্যে আমরা মাঝে মাঝে নগরসভ্যতার নাগপাশ এড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়তে পারি। তাতে আমাদের শ্রবণযন্ত্র খানিকটা বিশ্রাম পাবে সন্দেহ নেই।

কার্বাইডে পাকানো ফল কি ক্ষতিকর ?

গাছে পাকা কলা আম এখন অতীতের কথা। এখন যে-কোনো বাজারের কলা আম মানেই রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তার পাক ধরেছে।

এই জাতীয় পাকানো ফল কি গাছ পাকা ফলেরই মতন—গাছ পাকা ফল শরীরের জন্যে যতটা কাজ করে, এ ফলও কি সে-রকম ? না কি এ ফল শরীরের অনিষ্ট করে, শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর ?

গাছে ফল কিভাবে পাকে ?

কোনো ফল পাকবার সময়ে যে-সব জৈব রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে তাতে শ্বেতসার শর্করায় রূপান্তরিত হয়। আর কাঁচা ফলের সবুজ রংয়ের কারণ যে ক্লোরোফিল তা পাকা ফলের কেরোটিন জাতীয় পদার্থে পরিণত হয়। পাকা ফল তাই হলদে দেখি। তা ছাড়া পাকা ফলে অম্লের পরিমাণও কম।

ফল পাকার সময়ে তার শ্বাস-প্রশ্বাসেরও একটা কাজ থাকে। ফল যখন পাকতে শুরু করে তখন শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত পড়ে আর শ্বাস-প্রশ্বাস যত দ্রুত পড়ে ততই পাকার কাজ দ্রুততর হয়।

কোল্ড স্টোরেজে রাখা খাদ্যবস্তু বেশিদিন ভাল থাকে কেন ? সেখানে অল্প তাপে শ্বাসক্রিয়া ধীরে চলে, তাই। খাদ্যবস্তু দীর্ঘকাল ঠিক থাকে সেইজন্যে। এই শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ গাছ থেকে খসে পড়ার পরেও বন্ধ হয় না। তখনও সে নেয় অক্সিজেন আর ছাড়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড।

ফল যখন পাকে উদ্বায়ী রাসায়নিক পদার্থ সব নির্গত হয়। যে-সমস্ত গ্যাস বেরিয়ে আসে সে-সময়ে, তার মধ্যে ইথিলিন অন্যতম। দেখা গেছে, এই ইথিলিন তাড়াতাড়ি জমতে শুরু করলে ফলে তাড়াতাড়ি

পাক ধরে। অবশ্য এর সঙ্গে উপযুক্ত তাপেরও প্রয়োজন। বিভিন্ন ফল থেকে ইথিলিন যা বেরিয়ে আসে তার পরিমাণ ভিন্ন। কলাতে দেখা গেছে ইথিলিন খুব সামান্যই বেরোয়। সামান্য ইথিলিন গ্যাসে রাখলে তাই কলা খুব তড়াতাড়ি পেকে ওঠে। কলার ক্ষেত্রে এই কৃত্রিম উপায়ে ফল পাকানোর পদ্ধতি খুবই ভাল ফল দিচ্ছে। পৃথিবীর অনেক জায়গায় ইথিলিন গ্যাসের সাহায্যে কলাকে খুব তাড়াতাড়ি পাকিয়ে নেওয়া হচ্ছে। আমকেও ভালভাবে পাকানো যায় এই ইথিলিন গ্যাসের সাহায্য নিয়ে।

বাতাসে কি পরিমাণ ইথিলিন থাকলে ফলকে তাড়াতাড়ি পাকানো যায়? দেখা গেছে, দশ লক্ষ ভাগ বাতাসে মাত্র এক ভাগ ইথিলিন থাকলেই ফল তাড়াতাড়ি পাকানো সম্ভব, অনেক সময়ে অবশ্য আরও বেশি গ্যাস দেওয়া যেতে পারে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, আমাদের দেশে ইথিলিন দিয়ে ফল পাকানোর রেওয়াজ নেই। তার বদলে অ্যাসিটিলিন দিয়ে ফল পাকানো হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে। অ্যাসিটিলিন কি? কারবাইডে জল দিলে যে গ্যাস বেরোয় তাই অ্যাসিটিলিন এবং তা দিয়ে আমরা গ্যাসবাতি জ্বালাই। অ্যাসিটিলিন ইথিলিনের চেয়ে অনেক বেশি অপরিপৃক্ত যৌগ। কিন্তু খাদ্যগুণের সঙ্গে এর আজ পর্যন্ত আর কোনো প্রতিক্রিয়া হয় কিনা জানা যায়নি। তা ছাড়া ইথিলিন ছিল ফল পাকানোর প্রক্রিয়ায় একটি স্বাভাবিক উপাদান কিন্তু অ্যাসিটিলিন তো সে-রকম স্বাভাবিক কোনো উপাদনে নয়। সে একেবারে বাইরের বস্তু। ফলে তার ক্ষতিকর দিক থাকাই তো সম্ভব। তার উপর ইথিলিন যেখানে বিষাক্ত নয়, অ্যাসিটিলিন সেখানে বিষাক্ত বা Toxic।

কারবাইডে পাকানো ফলে আজ বাজার ছেয়ে গিয়েছে। অথচ এ-জাতীয় ফল খাওয়ায় অনিষ্টের সম্ভাবনা মনে হয় শতকরা ৮০ ভাগের কম নয়।

কিন্তু এই কারবাইডে পাকানো ফল নিয়ে আজ পর্যন্ত আমাদের দেশে কোথাও তেমন কোনো গবেষণার খবর নেই। না কলকাতার একাধিক গবেষণাগারে, না বাইরে। ভাবলে অবাক হতে হয়।

অ্যানটেনাতে বাজ পড়লে টি-ভিকে বাঁচাব কি করে?

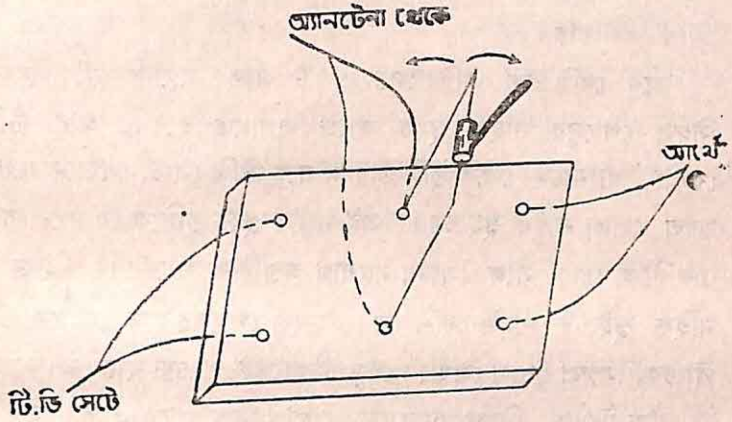
রেডিও বা টিভি সেট যাঁদের আছে ঝড় বাদলে এ দুশ্চিন্তা তাঁদের সকলেরই হয়। যদি অ্যানটেনাতে বাজ পড়ে! ফলে যেই ঝড়-উঠবে, বিদ্যুৎ চমকাবে, বাজ পড়বে অমনি এঁরা সকলেই যে মনে মনে একটু চঞ্চল হয়ে উঠবেন, এতে আর সন্দেহ কি? এরিয়াল বা অ্যানটেনা কার কার আছে? এরা আছে রেডিও আর টেলিভিশনের; কিন্তু ট্রানজিস্টার রেডিওর নয়। তাছাড়া দূরদর্শন বা বেতারকেন্দ্র যেখানে বেশিদূরে নয়, সেখানে ইনডোর এরিয়ালেই কাজ চলে। তখনও বাজ পড়ার কারণ থাকে না।

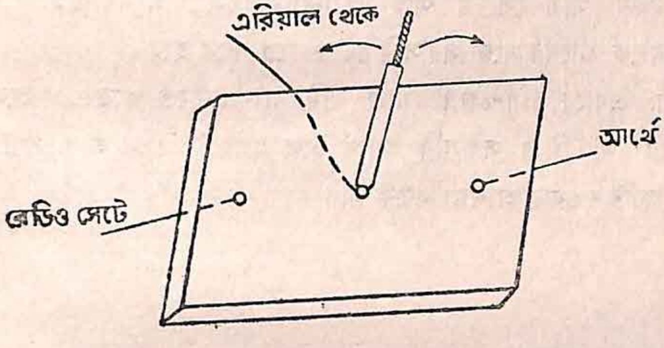
বাজ কোথায় পড়ে?

ভূপৃষ্ঠের উপরে আশেপাশের থেকে উঁচুতে যদি কোনো ছুঁচোলো বস্তু থাকে তার উপরেই বাজ পড়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। চারিদিকে অনেক গাছের মধ্যে যেখানে তাল বা নারকেল গাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সকলের উপরে সেই অঞ্চলে বাজ যদি পড়ে তো সেই বাজ বেশি পড়ে তাল বা নারকেল গাছের মাথাতেই। সেদিক দিয়ে আশেপাশের চেয়ে উঁচু বাড়ির মাথার অ্যানটেনার উপরে বাজ পড়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি। অথচ কলকাতায় দশ-পনেরো. তলা উঁচু বাড়ির যে-কোনো ছাদে একাধিক অ্যানটেনা নজরে আসে।

তাছাড়া বাজ যখন পড়ে সে পড়ে তার প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে। মনে হতে পারে, রেডিও বা টিভি সেট যদি বন্ধ রাখি তো পুরোপুরি নিশ্চিন্ত।

কিন্তু না, সে কথা ঠিক নয়। বাজ পড়ার সময়ে প্রচণ্ড ভোল্টেজ উৎপন্ন হয়, ফলে তখন রেডিও বা টিভি সেটা চলা না চলায় বিশেষ কোনো তারতম্য হয় না।





তাহলে এ সময়ে কী করব?

যদি অ্যানটেনার চেয়ে কিছুটা উঁচুতে লাইটনিং অ্যারেস্টার রাখা যায়, তাহলে বাজকে টানবে ওই অ্যারেস্টারেই, অ্যানটেনাতে নয়। তাছাড়া অ্যানটেনা যে কাঠামোটির মাথায় দাঁড়িয়ে আছে তাকেও লাইটনিং অ্যারেস্টার হিসাবে কাজে লাগানো চলতে পারে। কিন্তু বাজ যখন পড়ে তখন টেলিভিশন বা রেডিওকে বাঁচাবার সবচেয়ে ভাল

উপায় বোধ হয় অ্যানটেনাকে সেট থেকে আলাদা করে আর্থ করে রেখে দেওয়া। পদ্ধতিতে জটিলতা কিছু নেই। অ্যানটেনার যে সংযোগ সরাসরি টিভি বা রেডিওতে এসে পৌঁচেছে একটা নাইফ সুইচ দিয়ে তাকে রেডিও বা টিভি সেট থেকে আলাদা করে খুব সহজেই 'আর্থ' করা যায়।

তবে রেডিওতে এরিয়ালের একটি মাত্র সংযোগসূত্র, সেখানে সিঙ্গল পোলের নাইফ সুইচ কাজে লাগাতে হবে। আর টিভির বেলায় অ্যানটেনা থেকে দুটি তার আসছে টিভি সেটে, সেখানে দরকার ডবল পোল নাইফ সুইচের। এই নাইফ সুইচ দুদিকে ঘোরানো যায়। একদিকে তার সঙ্গে সেটের সংযোগ অন্যদিকে আর্থের। এই জাতীয় নাইফ সুইচের দামও বেশি নয়। ডবল পোলের দাম যেখানে টাকা পাঁচেক, সিঙ্গল পোল সেখানে দেড় টাকাতেই পাওয়া যায়।

ঝড় উঠেছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বাজ পড়তে পারে এরকম সম্ভাবনা দেখা দেওয়া মাত্র সেটের সঙ্গে অ্যানটেনার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে অ্যানটেনাকে আর্থের সঙ্গে সরাসরি যোগ করে দিতে হবে।

ব্যস, এবারে নিশ্চিন্ত। বাজ যদি অ্যানটেনাতে পড়েও, তাহলে তা সেটে না গিয়ে সরাসরি আর্থে চলে যাবে। তখন আর সেটের কোনো ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

নতুন জ্বালানি কি আসছে?

পরিবহণ সভ্যতার বহুমুখীন বিকাশের একটা উল্লেখযোগ্য মাপকাঠি। আজ সেই মাপকাঠি ধরে আমরা দ্রুত গরুর গাড়ি, পালকির চৌহদ্দী পার হয়ে এসেছি এবং গতির পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান বিশ্ব ও ব্রহ্মাণ্ডকে অনেক সংক্ষেপিত করে এনেছি।

কিন্তু সভ্যতার বিকাশ তাসের এক পিঠ মাত্র। তার অন্যদিকও

আছে। সে-দিক মালিন্য সংক্রান্ত পরিচয় বহন করে। পরিবহণের ক্ষেত্রে সে কথা প্রযোজ্য। পরিবহণের উন্নতি আমাদের পরস্পরকে যেমন নিকটতর করে এনেছে তেমনই তা আবার দূষিতকরণের সমস্যাটিকেও এক বিপজ্জনক সীমার দিকে নিয়ত ঠেলে নিয়ে চলেছে।

যেমন নিজেকে কর্মক্ষম রাখার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন তেমনি গাড়ি চালাতে জ্বালানির প্রয়োজন। সে জ্বালানিতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শক্তির উৎপাদন। এই রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরিত্যক্ত হয় কারবন ডাই-অক্সাইড, কারবন মনো-অক্সাইড এবং নাইট্রোজেন মনো-অক্সাইড। এর সবক'টিতেই মাত্রাভেদে অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে।

বর্তমানে জ্বালানি হিসেবে তরল হাইড্রোজেনকে কাজে লাগানোর চেষ্টা চলেছে। এর ব্যবহারিক উপযোগিতা যেমন বহুমুখীন তেমনি দূষিতকরণ রোধেও এ অনন্যসাধারণ। অন্যান্য জ্বালানিতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় দূষিত পদার্থ যে পরিমাণে নির্গত হয় তরল হাইড্রোজেনে সে পরিমাণ অকিঞ্চিৎকর, তার দশ ভাগের এক ভাগ মাত্র।

এ উদ্যোগ খুবই আশাপ্রদ। আমাদের যানবাহন যেখানে ক্রমবর্ধমান, সেখানে এমন একটি জ্বালানিই সকলের আকাঙ্ক্ষিত যা পরিবেশকে সামান্যই দূষিত করে তোলে। ফলে হাইড্রোজেন চালিত যানবাহন স্বাস্থ্যকর বিবেচনায় অনতিবিলম্বে এর প্রচলন হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

মাংস খাওয়ার পরে দুধ খাওয়া কি অনুচিত?

খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কে আমরা শোনা কথার উপর ভিত্তি করে কয়েকটি বিধিনিষেধ আরোপ করে আসছি। এবং এই বিধিনিষেধ একেবারেই সীমিত, মাত্র দু-চারজন এই নিষেধাজ্ঞার সঙ্গে পরিচিত বা এই নিষেধাজ্ঞা মেনে আসছেন এমন কথা কিছুতেই বলা যায় না।

আমরা আমাদের মা-মাসী, দিদিমা, ঠাকুমার কাছ থেকে শুনেছি মাংস খাওয়ার পরে দুধ খেয়ো না—দুধ খাওয়া উচিত নয়। ছোটরা এই একই সতর্কবাণী শুনেছে আমাদের কাছ থেকে। স্নেহাস্পদের মঙ্গল সকলেই কামনা করে। ফলে বৈজ্ঞানিক দিক দিয়ে বিষয়টি যাচাই না করেই আশঙ্কা যেখানে থাকতে পারে সেখানেই গুরুজনের সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়।

কিন্তু সত্যই কি মাংস খাওয়ার পরে দুধ খাওয়া অনুচিত? মাংস খাওয়ার পরে দুধ খেলে তা কি শরীরের অনিষ্ট করে?

যাঁরা ভোজনবিলাসী তাঁরা কি বলবেন জানি না, কিন্তু খাদ্য বিশেষজ্ঞরা ভোজনবিলাসীদের নিরাশ হওয়ার মত কোনো কথা বলছেন না।

মাংসকে আমরা সকলেই ঈষৎ গুরুপাক বলে মনে করি। আসলে মাংস সাধারণভাবে আমাদের প্রাত্যহিক খাদ্যসূচিতে থাকে না। ফলে যেদিন মাংস আমাদের খাদ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়, সেদিন মশলার বিশেষ আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। সেদিন স্বাভাবিক পরিমাণের চেয়ে আমরা কিছু অধিক ভক্ষণ করি। যা স্বাভাবিক নয়, তাই-ই তো অস্বাভাবিক। পেটের এই অস্বাভাবিক অবস্থায় দুধ খাওয়াটা কি ঠিক হবে? না হলে দুধ ভাল, মাংসও ভাল। কিন্তু কোনো কিছুর অতিরিক্তের বেলাতেই ভয়।

সেইজন্যেই বোধহয় ওই কথাটি প্রচলিত হয়ে গেছে, মাংস খাওয়ার পরে দুধ খাওয়া ঠিক হবে না।

লোডশেডিংয়ের বিকল্পে সৌরশক্তি কাজে লাগানো যায় না?

বিদ্যুতের ঘাটতিতে আজ সৌরশক্তিকে কাজে লাগানোর কথা তেমনভাবে না ভাবলেও, একদিন সূর্য ছাড়া আমাদের আর যে কোনো বিকল্প পথ নেই এ কথা প্রায় সুনিশ্চিত।

সূর্যকে নিয়ে সম্ভাবনা সীমাহীন। যে সূর্যরশ্মি আমাদের পৃথিবী পৃষ্ঠে এসে পৌঁছোয়, যদি কোনো মন্ত্রবলে তাকে শক্তিতে রূপান্তরিত করা যেত, তাহলে উৎপন্ন শক্তির পরিমাণ দাঁড়াত অফুরন্ত। অভাবের এই পৃথিবীতে তা সহজ কথা নয়। সূর্যের যে আলো সে ছড়িয়ে দিচ্ছে পৃথিবীর পথে-প্রান্তরে, ঘাস, মাঠ, লোকালয়ের উপরে, সেই আলাকে কি প্রয়োজনমত সংহত করে, সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করা যায় না? সংখ্যাবিদেরা এক হিসেবে বলেছেন, সূর্যের যে আলোকরশ্মি পৃথিবী-পৃষ্ঠে এসে পড়ে, যদি তাকে শক্তিতে রূপান্তরিত করা যেত, তাহলে পৃথিবীর সমস্ত শক্তি-উৎপাদনকেন্দ্রের মিলিত উৎপাদন শক্তির চেয়ে তার পরিমাণ হত প্রায় লক্ষগুণ বেশি।

অবশ্য বিশ্বের কোনো কোনো দেশ ইতিমধ্যেই শুধু তত্ত্বের দিক দিয়ে নয়, বাস্তবে সৌরশক্তি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সৌর সংগ্রাহকের ব্যবহার শুরু করেছে। বাড়ির ছাদে সৌর সংগ্রাহক বসিয়ে অন্দর-মহলের শৈত্যকে দূর করা হচ্ছে। এমনকি যেখানে উত্তাপ, সেখানেও সৌরশক্তি প্রয়োগ করে শৈত্য সঞ্চার চলেছে।

কিন্তু লোডশেডিং?

যে বিদ্যুতের ঘাটতির জন্যে আমাদের পশ্চিমবাংলায় প্রচণ্ড লোডশেডিং এবং আমরা সবাই বিপর্যস্ত, সৌরশক্তি প্রয়োগ করে বিদ্যুতের উৎপাদন বাড়িয়ে সেই লোডশেডিং বন্ধ করা যায় না?

এখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে কি ভাবে? লোডশেডিংয়ের মূল কথা হল টারবাইন ঘোরানো। যেখানে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন সেখানে জলের স্রোতে টারবাইন ঘোরে, নাহলে যেখানে কয়লার ব্যবহার, সেখানে কয়লা পুড়িয়ে উত্তাপের সৃষ্টি আর সেই উত্তাপ অবলম্বনে উচ্চচাপে বাষ্পীকরণ চলে। সূর্যকে প্রয়োগ করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে সূর্য কাজ করবে কয়লার আদর্শ বিকল্প হিসেবে। কয়লাকে পুড়িয়ে যে উত্তাপ সৃষ্টি সূর্যকে অবলম্বন করে সে উত্তাপ সৃষ্টি হবে কেমন করে? এমন তো নয়, সূর্যরশ্মি সরাসরি বয়লারে আপতিত হয়ে

বয়লারের জলকে বাষ্পীভূত করবে? যদি এরকম ব্যবস্থা করা যায়, আয়নায় প্রতিফলিত সূর্যরশ্মি অভিসারী হয়ে গিয়ে পড়বে বয়লারে, তাহলে সেই বয়লারে রাখা জল উত্তপ্ত হবে এবং ফুটবে। কিন্তু একটি আয়নার সাধ্য কি, বয়লারের জলে অভীষ্ট তাপমাত্রার সঞ্চার করে। ফলে অনেকগুলি আয়না বয়লার স্তম্ভের পাশে দীর্ঘস্থান জুড়ে সার বেঁধে দাঁড়ানো সৈনিকদের মত এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত হয়ে এসে পৌছোয় ওই বয়লারে। নির্দিষ্ট তাপমাত্রা সৃষ্টি হলেই ফুটন্ত জল বাষ্পীভূত হবে। তার প্রচণ্ড চাপ গিয়ে পড়বে টারবাইনের উপরে; টারবাইন ঘুরবে এবং স্বাভাবিক ভাবেই বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে।

অবশ্য সৌরশক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে আর একটি দিক আছে। দিবস রজনীর মাত্র অর্ধেকে সূর্যের স্থিতি—বাকি সময়ে তার অদর্শন। বর্ষা-বাদলেও সে অনিয়মিত। এই সময়ের জন্যে করণীয় কি? যে অদর্শন আকস্মিক, বিপদ সেখানেই। কিন্তু যে বিরহ নিয়মমাফিক সেখানে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে অগ্রসর হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। অর্থাৎ সূর্যরশ্মি ধরে তাকে পূর্বেই সঞ্চয় করে রাখা। বিজ্ঞানীরা বর্তমানে সেদিকটির কথাও ভেবে দেখছেন।

এখনও সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ অন্যান্য বিদ্যুতের তুলনায় অবশ্যই বেশি। কিন্তু গত পাঁচ বছর আগের খরচের চেয়ে আজ তা অনেক কমেছে। বরং অন্যান্য বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ দিনে দিনে উর্ধ্ব-মুখীন। ভবিষ্যতে একদিন এমন হবে বলে বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন, যেদিন সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় অনেক কমবে এবং অন্যান্য বিদ্যুতের উৎপাদন ব্যয় সৌরবিদ্যুৎকে ছাড়িয়ে যাবে। নিঃসন্দেহে সেই অনাগত ভবিষ্যৎ আমাদের কাছে অনেক আশার আলো নিয়ে আসবে।

শীতে কি এই শহর অবরুদ্ধ ?

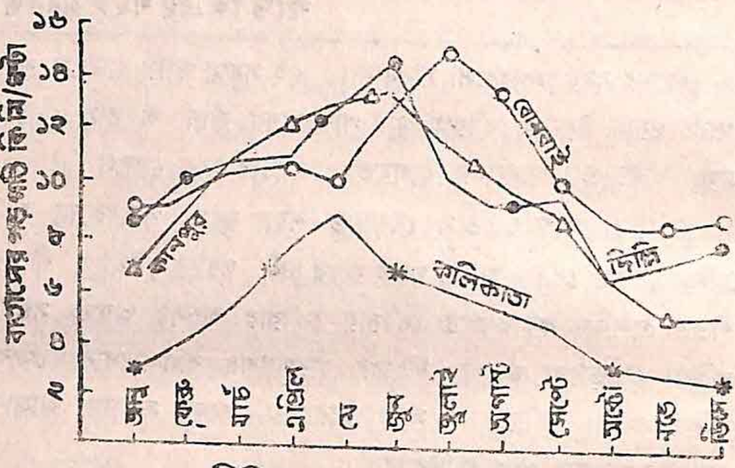
শীতের সময় নগরবাসী সাবধান। এই সময়ে ভারি বাতাসে, শান্ত আবহাওয়ায়, উনুনের ধোঁয়ায় আর পরিবহণের জীর্ণ অবস্থায় চোখের জল, নাকের জল আমাদের বিশেষভাবে অসহায় করে তোলে।

ধোঁয়ার আস্তরণ ভেসে বেড়াচ্ছে শহর জুড়ে, পরিবহণের অর্ধ-পোড়া তেলের ধোঁয়া আছে, গৃহস্থ ঘরের চুল্লী, দুধারে ফুটপাথে শীতের তীব্রতা প্রশমিত করার জন্যে ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় অস্পষ্ট অস্বচ্ছ সন্ধ্যা-গুলিতে পোড়ানো জঞ্জাল, শহরের চারপাশের কলকারখানা থেকে বেরিয়ে আসা ধোঁয়া, এ সবই মারাত্মক, এদের সকলের আঘ্রাণ আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক।

অতি সম্প্রতি খাটাল আংশিক অপসারণের জন্যে জ্বালানির একটা উল্লেখযোগ্য অংশ কমে গিয়েছে। ঘুঁটে আর কয়লা নিয়ে কলকাতায় প্রাত্যহিক জ্বালানির প্রয়োজন ১২শ টনের মত। ধোঁয়া নিয়মিত আসছে এ থেকে। অবশ্য এখন ধোঁয়াহীন কোক কয়লাও তৈরী হচ্ছে। তার পরিমাণ ঘুঁটে আর কয়লার সিকি ভাগ হবে। কিন্তু শহরকে ধোঁয়া আর বিপদমুক্ত রাখার ক্ষেত্রে সে কতটা অংশ নিতে পেরেছে ভাববার কথা।

ধোঁয়া যে অস্বাস্থ্যকর এবং বিপজ্জনক এ কথা মনে রেখে স্মোক ন্যুইসেন্স অ্যাক্ট সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয় আজ থেকে ৭০।৭২ বছর আগে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার কথা। কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল এবং ব্রিটিশ স্থাপত্যকে ধোঁয়ার হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে লর্ড কার্জন শেফিল্ড থেকে বিশেষজ্ঞ নিকলসন সাহেবকে নিয়ে এলেন। তখন ধোঁয়ার উৎস ছিল শ'তিনেক চালকল, তেলকল, জাহাজ আর রেলের ইঞ্জিন। স্মোক ন্যুইসেন্স অ্যাক্ট অব বেঙ্গল

চালু হল ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে। অ্যাক্ট অব বেঙ্গল আইনের আওতায় কিন্তু সমস্ত বাংলাদেশ ছিল না। কলকাতা করপোরেশন, হাওড়া



বিভিন্ন মাসে বাতাসের গড় গতি

পৌরসভা এবং তৎসংলগ্ন ৬০/৭০ বর্গমাইল ছিল এই ধারার অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে কলকাতা এবং হাওড়াকে নিয়ে প্রায় ১০০ বর্গমাইল এই আইনের আওতায় আসে। শিল্পের বিস্তার ঘটছে হু-হু করে। যে চিমনি ছিল এক সময়ে কয়েক শোতে নির্দিষ্ট, এখন সে চিমনির সংখ্যা ১০০০০-এর উপরে এসে পৌঁচেছে। সভ্যতার বিচারে ১৯০৫ এবং ১৯৭৭।৭৮-এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য ঘটেছে। যানবাহন এবং শিল্পের যে বিস্তার এবং যে হারে বিস্তার হয়েছে তা অভাবনীয়। ১৯০৫-এর পরিচয় দিতে পারেন এমন যদি কোনো প্রত্যক্ষদর্শী থাকেন তাহলে তিনি বলবেন, হ্যাঁ, কলকাতা আছে কলকাতাতেই। কিন্তু এ কলকাতা সে কলকাতা নয়!

কলকাতা দূষিত এবং রীতিমত দূষিত এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই দূষিত নগরীকে কিছুটা ভারমুক্ত করা যায় কি করে? ভারতবর্ষে শিল্পসমৃদ্ধ এবং জনবহুল আরও নগরী আছে; কানপুর,

দিল্লী, বোম্বে। এইসব নগরীর পরিবেশও নির্মল বলা চলে না, কিন্তু কলকাতার মত মারাত্মক অবস্থা আর কোথাও নয়।

এই দূষিত পরিবেশে আবদ্ধ মহানগরীকে কি কিছুটা পরিশু দ্ধকরা যায় না ?

ঘরভর্তি ধোঁয়া—সে ধোঁয়াকে তাড়ানোর জন্যে আমরা কি করি ? চারপাশের দরজা-জানালা খুলে দিই মুক্ত বায়ুর আশায়। কলকাতা এমন এক নগরী যেখানে অন্যান্য নগরীর তুলনায় মুক্ত বায়ুর প্রাচুর্য খুবই সীমিত। বোম্বে, দিল্লী, কলকাতার রেখাচিত্র দেখলে এই তথ্যের যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে।

কলকাতার ময়দান এখন অপসৃয়মান। যে বৃক্ষরাজি কলকাতার আবহাওয়াকে কিছুটা বিশুদ্ধ রাখতে পারে, তাও প্রায় ইতিহাসে রূপান্তরিত হতে চলেছে। শীতের সময়ে কলকাতায় বাতাসের সবচেয়ে মন্দগতি। ভারী এবং দূষিত বাতাসে অবস্থা তখন দুঃসহ। এই অবস্থায় প্রকৃতি দেবী যদি না একটু কৃপা করেন, মুক্ত বায়ুর দাক্ষিণ্য যদি না পাই, তাহলে আর কিভাবে আমরা এই অবস্থাকে কাটিয়ে উঠব ?

রুই-কাৎলাই কি সেরা মাছ ?

আজকাল বাজারে কিছু বিদেশী মাছের আমদানী হচ্ছে। আমেরিকান রুই তো আছেই, তাছাড়া দেখি চীনদেশীয় রুপোলী রুই মাছ। আনন্দের কথা, দেশের বাইরে থেকে এই ধরনের বিদেশী মাছ আসছে না, এখন আমাদের এখানেই এসব মাছের চাষ শুরু হয়েছে।

কিন্তু এই মাছকে আমরা মৎস্যভোজীরা কতটা সহজভাবে গ্রহণ করেছি ? চীন আমেরিকায় এদের উৎস হলে কি হবে, চাষের প্রয়োজনে আমাদের দেশে নিয়ে আসার পরে যখন এই মাছ বাজারে

আসতে আরম্ভ করল, তখনও রুই এমন একটি অভিজাত নাম নিয়েও রুই-কাৎলার সমগোত্রীয় হিসেবে কিছুতেই তাকে আমাদের মনে ধরল না। তুল্যমূল্যে রুই-কাৎলার চেয়ে তাই সে এখনও সস্তা, এখনও সে আমাদের কাছে তেমন কৌলীন্য অর্জন করতে পারেনি।

কিন্তু এই অকৌলীন্যের কারণ কি ?

এ কি আমাদের অভ্যাস এবং সংস্কারের ফল ? না কি এর পিছনে কোনো বৈজ্ঞানিক কারণ আছে ?

রুই-কাৎলা আমাদের কাছে সেরা মাছ, বিশেষ করে মাথা ছোট হওয়ার জন্যে রুই। তাছাড়া একটি রুই মাছে যতটা মাছ কাঁটার পরিমাণ তার তুলনায় যৎসামান্য। চোখের নজরটাও মাছ পছন্দের ক্ষেত্রে বড় কম কথা নয়। কিন্তু খাদ্যগুণে ? সত্যি কথা বলতে কি আমরা যে রুই-কাৎলা খাই, তার চেয়ে এই আমেরিকান ও চৈনিক রুই খাদ্যগুণে কোনোভাবেই আলাদা হওয়ার কারণ নেই এবং রসনাকেও এরা পরিপূর্ণ তৃপ্ত করে। মাছের তুলনায় কাঁটাও এতে বেশি নয়।

তাছাড়া এইসব মাছের চাষ দুরূহ বা ব্যয়সাধ্যও বলা যায় না। বিদেশী গন্ধ থাকলেও এরা তৃণভোজী, শ্যাওলা খেয়ে বেঁচে থাকে। যদি আমরা সংস্কার কাটিয়ে উঠি এবং আমাদের দেশে এইসব মাছের চাষ প্রভূত পরিমাণে বাড়িয়ে তোলা যায়, তাহলে এরা একদিন মাছের বাজারের আকাল আনকটা দূর করতে পারবে।

সাইক্লোন কাকে বলে ?

প্রচণ্ড ঝড়, জল, বৃষ্টি, সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল প্লাবিত হওয়া, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি, জীবন বিনষ্ট, শস্যহানি—সাইক্লোন বলতে এইরকম এক ভয়ঙ্কর চিত্রই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

কিন্তু আবহবিদেরা সাইক্লোনের কি সংজ্ঞা দেন ?

তাঁরা বলছেন, সাইক্লোন আবহমণ্ডলের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এক প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়। এই ঘূর্ণিঝড়ের উৎস গভীর সমুদ্র। তারপর তা ভয়ঙ্করের পরোয়ানা নিয়ে তটদেশের দিকে ধাবিত হয়।

সাইক্লোনের উৎপত্তি ক্রান্তিয় বা উষ্ণ সমুদ্র অঞ্চলে। সমুদ্রের কোনো নিম্নচাপ অঞ্চলে তার অঙ্কুরোদ্‌গমের পরে সমুদ্রের পৃষ্ঠভাগের অফুরন্ত জলীয় বাষ্প তাকে সীমাহীন শক্তি জোগায়। এই শক্তি সঞ্চয় করতে করতে সে উত্তর গোলার্ধে অগ্রসর হয় পশ্চিমে বা উত্তর-পশ্চিমে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে পশ্চিম বা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। আমাদের ভারতবর্ষ উত্তর গোলার্ধে। এখানে তার গতিপথের লক্ষ্য পশ্চিমে বা উত্তর-পশ্চিমে।

সাইক্লোনের চেহারা একটি বায়ুস্তম্ভের মত। এই বায়ুস্তম্ভের মধ্যে বায়ুপ্রবাহ চলে সর্পিলগতিতে। উল্লম্বভাবে সাইক্লোনের বায়ুপ্রবাহ কয়েক কিলোমিটার কিন্তু অনুভূমিক দিক দিয়ে এর বিস্তৃতি ১৫০ থেকে ১০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। যদি আমাদের বঙ্গোপসাগরে তেমন কোনো সাইক্লোন দেখা দেয়, তাহলে তা বঙ্গোপসাগরের একটা বিরাট অংশেই পরিব্যাপ্ত থাকবে। অবশ্য আকৃতিতে ক্ষুদ্র হলে অন্য কথা। তখন তার ব্যাসও শীর্ণ হয়ে আসে। ওই সময় হয়তো তা ১০০ থেকে ১৫০ কিলোমিটারের মধ্যেই নির্দিষ্ট থাকবে।

সাইক্লোনের পথ পরিক্রমাও কখনও কখনও অতি দীর্ঘ। বর্ষা নামার আগে বা পরে এক-একটা সাইক্লোন ৮০০ কিলোমিটারের চেয়েও বেশি পথ চলে। প্রত্যহ পথ চলার একটা সাধারণ পরিমাণ ৩০০ থেকে ৫০০ কিলোমিটার এবং ঘণ্টায় সাধারণভাবে তা ২৫ কিলোমিটারের চেয়ে বেশি নয়।

কিন্তু এই ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্যয় সাইক্লোন গতির দিক দিয়ে রীতিমত বিচিত্র। একই সাইক্লোনের চলার পথের বিভিন্ন সময়ে

বিভিন্ন গতি। ভিন্ন সাইক্লোনের বেলায় তো কথাই নেই। কোনো কোনো সাইক্লোন দেখা যায়, প্রায় তিন-চারদিন অচল, অনড়, একই জায়গায় থেকে যাচ্ছে। আবার কেউ চলার পথের এক এক পর্যায়ে দিনে ১০০০ কিলোমিটারের মত পথ চলে।

একদিকে সাইক্লোনের অনিশ্চয়তা, অন্যদিকে তার ভয়াবহ চরিত্র। শুধু তার ভয়াবহ চরিত্রই যথেষ্ট। কিন্তু তার আকস্মিকতায় সে আরও মারাত্মক, আরও বিপজ্জনক। তবু তার সঠিক পূর্বাভাষ দিতে পারলে আত্মরক্ষার একটা চেষ্টা চলে, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস পায়। বিজ্ঞানীরা এ-দিক দিয়ে চেষ্টা করেছেন এবং অনেকটা সফলও হয়েছেন।

রেডার সাইক্লোনের অস্তিত্ব নির্ণয়ে একটি বড় উপকরণ। কিন্তু তার চেয়েও বড় যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারটি আমাদের সাইক্লোনের প্রকোপ থেকে রক্ষা করবার জন্যে নিয়ত তৎপর প্রহরীর মত কাজ করে চলেছে, তা হল আবহাওয়া উপগ্রহ।

১৯৬০ সাল থেকে সোভিয়েট রাশিয়া এবং আমেরিকার আবহাওয়া উপগ্রহগুলি আমাদের সাহায্য করছে।

আজ সমুদ্রের গভীরে কোথাও সাইক্লোনের অঙ্কুরোদ্গম হলেই আমরা খবর পাই। কিন্তু সে অঙ্কুর যে পুষ্ট হয়ে পূর্ণতা লাভ করে আমাদের তটদেশকে আঘাত করবেই, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

রেডিও-ফটো কি?

কল্পনা করতে ভাল লাগে, দ্রুতগামী যান বা বাহক মারফত নয়, সহস্রাধিক মাইল দূরে অনুষ্ঠিত ক্রীড়ানুষ্ঠানের একটি বিশেষ স্মরণীয় মুহূর্তের চিত্র পরদিন সকালবেলায় মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময়ের ব্যবধানে সকলের পরিচিত একটি প্রিয় পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় পাঠকদের মনোরঞ্জনের জন্যে মুদ্রিত হচ্ছে। চিত্রটি সংগ্রহের সূত্রও উল্লিখিত ওই সঙ্গে—তা হল রেডিও-ফটো।

রেডিও-ফটো কি ?

রেডিও-ফটোর সঙ্গে সাধারণভাবে আমাদের সকলের পরিচয় থাকলেও আসলে তা কি এবং কিভাবে সে চিত্র সংগ্রহ করা হয়, সে সম্পর্কে আমাদের অনেকের ধারণাই সুস্পষ্ট নয়। অথচ তার মাধ্যমে বিভিন্ন চিত্র আসছে, আসছে দূর-দূরান্ত থেকে এবং নিয়মিত।

রেডিও-ফটো হল ফ্যাকসিমিলি ট্রান্সমিশন। ফ্যাকসিমিলি অবিকল প্রতিরূপ এবং ট্রান্সমিশন প্রেরণ। টেলিভিশনেও এই জাতীয় অবিকল প্রতিচ্ছবির প্রেরণ চলেছে। কিন্তু তা হল সচল অবস্থায়, সেখানে চিত্রটি সচল চিত্র। রেডিও-ফটোর ক্ষেত্রে এই চিত্র সচল নয়, কোনো কোনো ধারাবাহিক ঘটনার এক তাৎক্ষণিক মুহূর্ত, স্থির বা নিশ্চল চিত্র হিসেবে যার পরিচয়।

দূরান্তে চিত্র প্রেরণের এই পদ্ধতি বেতারের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। যে চিত্রটি প্রেরিত হবে, সেটিকে প্রেরকযন্ত্র-সংশ্লিষ্ট একটি ড্রামের সঙ্গে জড়িয়ে নেওয়া হয়। ছবিটি থাকে বাইরের দিকে। যন্ত্র যখন শুরু করে চলতে, তখন অতি সূক্ষ্ম এক আলোকরশ্মি চিত্রের এক প্রান্তে নিক্ষেপ করা হয়। যন্ত্র চলছে অর্থাৎ ছবি-জড়ানো ড্রামটি আবর্তিত হচ্ছে। ড্রামের উপরে নিক্ষিপ্ত আলোকরশ্মিও ঘুরে চলেছে সঙ্গে সঙ্গে। আলোকরশ্মির আবর্তন অনেকটা উঁচু বাড়ির পিছনের দিকে অকুলীন কাজে ব্যবহার্য ঘোরানো সিঁড়ির মতন। ঘুরে যাওয়া এবং সরে আসা। এইভাবে সম্পূর্ণ চিত্রটিই আলোকবেষ্টিত হয়। এই পদ্ধতির নাম স্ক্যানিং (Scanning)। এ অনেকটা টেলিভিশনে ব্যবহৃত স্ক্যানিং প্রক্রিয়ার অনুরূপ। কিন্তু টেলিভিশনে যেখানে সময় লাগে ৩০/১ সেকেণ্ড, সেখানে এ-ক্ষেত্রে সময়ের পরিমাণ কয়েক মিনিটের মত।

চিত্রগাত্রে এই যে আলোকরশ্মি নিক্ষেপ, এই আলোকরশ্মি প্রতিফলনের পরে রূপান্তরিত হয় বৈদ্যুতিক সঙ্কেতে। সঙ্কেতের মাত্রা বরাবর সমান নয়। চিত্রের আলো-আঁধারের অবস্থার সঙ্গে

সঙ্গে প্রতিফলিত আলোর মাত্রারও পরিবর্তন এবং সেই সঙ্গে বিদ্যুৎ সঙ্কেতেরও মাত্রা বদলায়।

প্রেরকযন্ত্র বিদ্যুৎ সঙ্কেতের এই বিভিন্ন মাত্রা দূর-দূরান্তে গ্রাহকযন্ত্রে এসে পৌঁছোয়। সেখানে তাদের আবার আলোকরশ্মিতে রূপান্তর ঘটে। আলোকরশ্মির আলো-আঁধারের মাত্রাভেদ থেকেই গ্রাহকযন্ত্রে ফুটে ওঠা নির্দিষ্ট চিত্ররূপটি কিম্বাচিত্ররূপের অবিকল প্রতিচ্ছবিটি আমরা সকলে দেখবার সুযোগ পাই।

জনসংখ্যা আমাদের কোথায় নিয়ে চলেছে ?

স্কুলের ভূগোলে পড়েছি পৃথিবীর তিন ভাগ জল এবং এক ভাগ স্থল—সংখ্যার উল্লেখে জল ৭১ ভাগ এবং বাকিটুকু স্থল অর্থাৎ ২৯ ভাগ। স্থলভাগের এই সম্পূর্ণ অংশই যে জীবনধারণ এবং খাদ্য উৎপাদনের উপযুক্ত তা নয়। স্থলভাগ যেমন সমস্ত পৃথিবীর প্রায় সিকি ভাগ ; ভৌগোলিক দিক দিয়ে অনুকূল, বসবাসযোগ্য এবং উৎপাদনযোগ্য স্থান সমস্ত স্থলভাগের তুলনায় সেই রকমই, স্থলভাগের শতকরা ২৫ ভাগ মাত্র।

ফলে সমস্ত পৃথিবীতে মনুষ্য বসবাসের উপযুক্ত স্থান এবং খাদ্য উৎপাদনের অনুকূল অঞ্চল পৃথিবীর এক সামান্য অংশ অধিকার করে রেখেছে। বিষয়টিতে চিন্তিত হওয়ার কারণ থাকত না, যদি না ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা আমাদের সম্মুখে এক ভয়াবহ চিত্র উপস্থাপন করত। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও নগণ্য নয়। আনন্দের কথা, সাম্প্রতিক-কালে বিজ্ঞানীরা এ সমস্যাটি সম্পর্কে সচেতন এবং এটির সমাধানে সচেষ্ট আছেন।

পৃথিবীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কিরকম ?

সংখ্যাবিদেরা যে-চিত্র উপস্থাপিত করেন তা থেকে অনুমান হয় যে, ১০০০ খ্রীস্টাব্দে পৃথিবীতে লোকসংখ্যা ৩০ কোটির বেশি ছিল না।

তারপর আরও হাজার বছর অতিক্রমের প্রান্তসীমায় আমরা এসে পৌঁচেছি। এ সময়ের শেষে পৃথিবীর জনসংখ্যা যেখানে গিয়ে পৌঁছোবে তা ৬০০ কোটির কম নয়। হাজার শতাব্দীতে ৩০ কোটি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬০০ কোটি। অবস্থা যদি একই রকম চলে তাহলে আমরা পরবর্তী পর্যায়ের সংখ্যাচিত্রও তুলে ধরতে পারি। ২০৩৩ খ্রীস্টাব্দে ১২০০ কোটি, ২০৬৬তে ২৪০০ কোটি এবং দ্বাবিংশ শতাব্দীর সূচনায় ৪৮০০ কোটি।

পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্যভাবে ত্বরান্বিত করেছি আমরা এশিয়াবাসীরা। সমস্ত পৃথিবীর বর্তমান জনসংখ্যা ৪০০ কোটির কাছাকাছি। এর মধ্যে এশিয়ার জনসংখ্যাই অর্ধেকের উপরে। অথচ ভূমির দিক দিয়ে এশিয়া কতটুকু? সমস্ত পৃথিবীতে স্থলভাগ যতটা, এশিয়াতে আছে প্রায় তার এক-পঞ্চমাংশ। ভারতবর্ষে তারও ১১ শতাংশ। কিন্তু এশিয়ার জনগণের শতকরা ২৫ জনই ভারতবর্ষের। এর থেকে একটা কথা সুস্পষ্ট যে, পৃথিবীর অন্যত্র মিলিতভাবে জনসংখ্যার যে ঘনত্ব, এশিয়ায় সেই ঘনত্ব বেশি এবং ভারতবর্ষে সে ঘনত্ব আরও গভীরে। প্রায় দশ বছর আগে ১৯৬৪ সালের এক হিসেবে দেখা যায় যে, প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ভারতবর্ষে আছে ১৫৫ জন, এশিয়াতে ৬৫ জন এবং সমগ্র পৃথিবীতে ২৪ জন।

ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বৃদ্ধির চিত্রটি থেকে এটুকু সুস্পষ্ট যে, আমাদের দেশের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ৬০ কোটির কাছাকাছি। পৃথিবীর জনসমষ্টির তুলনায় এই সংখ্যা কম নয় অথচ সমগ্র স্থলভাগের হিসেবে ভারতবর্ষ অনুল্লেখ্য, শতকরা ২.৪ ভাগ মাত্র।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির যে ধারাটি ভারতবর্ষকে আজ এরকম একটি অবস্থায় নিয়ে এসেছে সেটি কিন্তু বরাবর সমান ছিল না। ১৮৫০-এর পূর্বে ধারাটি ছিল ক্ষীণ, হয়তো জন্মহারকে মৃত্যুহার অনেকটা হ্রাস করে রাখত। পরবর্তীকালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারাটি গতিযুক্ত হয় এবং বর্তমানে বৃদ্ধির হার শতকরা ২-এর বেশিতে নির্দিষ্ট দেখা যায়।

জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে যে কিশোর-কিশোরীরা আগামী দিনে গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা নেয় তারা জনসংখ্যার শতকরা কত ভাগ? ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দে ১৫ বছরের চেয়ে কমবয়সী ছেলেমেয়েরা ছিল শতকরা ৪২ ভাগ। ভারতবর্ষ প্রসঙ্গে এই কথা বলছি।

এই কিশোর-কিশোরীরাই তো ভবিষ্যৎ জনসমষ্টি তৈরী করবে। আমাদের দেশে প্রতি বছর ১ কোটি ২০ লক্ষ নতুন মুখের অন্ন সংস্থানের প্রয়োজন। এমনিতে খাদ্য আমরা যতটুকু গ্রহণ করি পরিমাণে তা যথেষ্ট নয়। সেই খাদ্যও যদি আমরা একাসনে বসে সমভাবে ভাগ করে নিতাম, তাহলে যে মুষ্টিভিক্ষা আমাদের ভাগ্যে জুটত পরিমাণে তা হত সামান্য এবং তার অধিকাংশই শস্যকণা। আমরা ভারতবাসীরা নানাদিক দিয়ে জর্জরিত। যে সমস্যা আছে তার গুরুভারেই আমরা অবদমিত, তারপর প্রতি বছরই এই বিপুল সংখ্যক নতুন মুখের চিন্তা। বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের সকলের সমবেত সচেতনতাই একমাত্র এই সমস্যার সমাধান করতে পারে, অন্য কিছু নয়।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের দুটি দিক আছে। এক : জন্মহার নিয়ন্ত্রণ, অন্য : মৃত্যুহার বৃদ্ধি। বিজ্ঞানের উন্নতির যুগে দ্বিতীয়টি অভিপ্রেতও নয় এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে অসাধারণ উন্নতির জন্যে তার আশঙ্কাও নেই, যদি না প্রাকৃতিক বা রাজনৈতিক কোনো দুর্বিপাক ঘটে যায়। ফলে জন্মহার নিয়ন্ত্রণই একমাত্র পন্থা। যদি বর্তমান জন্মধারাটি আমরা অব্যাহত থাকতে দিই, তাহলে আগামী কয়েক শতাব্দীতেই পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষের জন্যে ৩ ফুট বাই ৩ ফুট জায়গা পাওয়াও কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। তখন আমাদের নিষ্পেষিত কর্মশক্তির কিভাবে স্ফুরণ ঘটবে কে জানে? সে মহাদুর্দিন কারোর কাছেই অভিপ্রেত নয়। বিজ্ঞানীরা কিভাবে এ সমস্যার সমাধান করবেন? তাঁরা নিশ্চয়ই সে দিনকে আমাদের কাছে সহজে আসতে দেবেন না। কিন্তু বিজ্ঞানীরা কি করবেন? পরমুখাপেক্ষী হয়ে আমাদের এ-জিজ্ঞাসার কোনো অর্থ হয় না। তত্ত্বগত দিক দিয়ে যে-কোনো পরিকল্পনা যত আকর্ষণীয় হোক না কেন, বাস্তবে তার রূপায়ণের দায়িত্ব আমাদের।

সব ব্যাঙের ছাতা কি খাদ্য ?

রন্ধনশালা থেকে বেরিয়ে আসার পরে ব্যাঙের ছাতার যে কোনো ব্যঞ্জন যে খাদ্য হিসেবে অত্যন্ত সুস্বাদু, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু সব ব্যাঙের ছাতাই কি খাদ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য ?

খাদ্য হিসেবে ব্যবহারের জন্যে যে নির্দিষ্ট ফাংগাস থেকে ব্যাঙের ছাতা পুষ্ট করে তোলা হয়, তাদের কথা এখানে আসছে না। কিন্তু বন্য অনেক ব্যাঙের ছাতা দেখা যায়, বর্ষায় গজাচ্ছে এখানে ওখানে, সেই সব ব্যাঙের ছাতা অতি উৎসাহীরা সংগ্রহ করেন রান্নার এক উপাদেয় উপকরণ হিসেবে।

এই সব ব্যাঙের ছাতার মধ্যে কয়েকটি আছে যেগুলি বিষাক্ত, খাদ্য হিসেবে যা গ্রহণ করলে বিষক্রিয়ায় শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ার যথেষ্ট আশঙ্কা থাকে।

তাহলে কি করব ? এই আশঙ্কার জন্যে কি সব ব্যাঙের ছাতাকে বর্জন করব ? না, তা কখনও নয়। কয়েকটি ব্যাঙের ছাতা বিষাক্ত বলে সব ধরনের ব্যাঙের ছাতা বর্জনের কোনো কারণ নেই।

কোন্ ব্যাঙের ছাতা বিষাক্ত তা বুঝব কি করে ? পরীক্ষা করার অবশ্য একটা উপায় আছে। সে কোনো দুরূহ প্রক্রিয়া নয়। এই জন্যে প্রয়োজন শুধু একটি রৌপ্য মুদ্রার। আজকালকার মুদ্রায় কতটা রৌপ্য আছে জানি না, কিন্তু যদি একটি রৌপ্যমুদ্রা জোগাড় করে ওই ব্যাঙের ছাতার উপরে কিছুক্ষণ চেপে ধরা যায় তাহলে যথার্থ বলে দেওয়া যাবে ওই ছাতা খাদ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য, কি নয় ?

ফল কি হবে ? রৌপ্যমুদ্রার যে দিকটি ব্যাঙের ছাতার উপরে

চেপে ধরা হয়েছে, যদি দেখা যায় সে দিকটি কালো হয়ে গিয়েছে, তাহলে ওই ব্যাঙের ছাতা বাতিল, খাদ্য হিসেবে তা অনুপযুক্ত। আর যদি মুদ্রা পূর্ববৎ থাকে, রৌপ্যপৃষ্ঠ আগের মতনই, তাহলে খাদ্য হিসেবে সে ব্যাঙের ছাতা গ্রহণে কোনো বাধা নেই।

কিন্তু অভোজ্য ব্যাঙের ছাতার বেলায় কালো হওয়ার কারণ কি ?

এই সব ব্যাঙের ছাতায় সালফার থাকে। মুদ্রার রৌপ্যের সঙ্গে তার একটা ক্রিয়া-বিক্রিয়া চলে। ফল সিলভার সালফাইড। এই সিলভার সালফাইড কালো বলে মুদ্রার যে দিকটি ব্যাঙের ছাতার উপরে বসানো হয়, সময়ের ব্যবধানে সেই ভাগটি কালো হয়ে যায়।

বন্য ব্যাঙের ছাতার মধ্যে কোন্‌টি ভোজ্য দেখবার সময়ে এই কালো রংটিই সতর্কবাণী হিসাবে কাজ করবে।

মাথা ধরার ওষুধ কি নিরাপদ ?

মাথা ধরেছে ? শরীর অবসন্ন বোধ হচ্ছে ? চটপট সারিয়ে তোলার জন্য ১০, ১৫ বা ২০ পয়সার তিনটি বড়ির একটিই যথেষ্ট, এই অভয়বাণীকে অবলম্বন করে আমরা অনেক সময়ে নানা ধরনের বটিকা গলাধঃকরণ করি। সাময়িক একটা আরাম হয় বটে, কিন্তু এ কথা আমরা ক'জন ভেবে দেখি, রোগের লক্ষণ মিলিয়ে ঔষধ সেবন সব সময়ে নিরাপদ নয়।

ঔষধ আমরা সেবন করি প্রত্যক্ষ ফল আর সুপরিকল্পিত বিজ্ঞাপনের দিকে লক্ষ্য রেখে, বিশেষ করে যখন মাথা ধরে, অবসাদ গ্রস্ত হই, সর্দি-কাশিতে ভুগি, গা ম্যাজম্যাজ করে। এ সব উপসর্গ আমাদের কাছে তেমন গুরুতর নয়, তেমন বিপজ্জনক বলে এদের আমরা মনে করি না।

কিন্তু প্রত্যক্ষ ফলের সঙ্গে সঙ্গে এ ধরনের অনেক ঔষধই পরোক্ষভাবে আমাদের শরীরে ক্ষতি করে যায়।

তবু এই ক্ষতির লক্ষণ যদি সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শরীরে দেখা দিত তাহলেও একটা উপায় ছিল। প্রাথমিক অবস্থাতেই আমরা চিকিৎসার সুযোগ নিতে পারতাম! কিন্তু এই পরোক্ষ ক্ষতির কাজ অত্যন্ত সূক্ষ্ম, শরীরের মধ্যে তা চলে গোপনে গোপনে।

ফলে নিয়মিত ঔষধ সেবনে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ যতদিন না দুরূহ হয়ে ওঠে, এই জাতীয় সহজলভ্য ঔষধের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়, ততদিনই আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকি এবং যখন তখন প্রায় অভ্যাসের বশে অ্যাসপিরিন বা অ্যাসপিরিন জাতীয় বটিকা গ্রহণ করি। কিন্তু তারপর যখন আর কোনো উপায় থাকে না, নিজের চিকিৎসা যখন অর্থহীন হয়ে পড়ে, তখনই আমরা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হই।

আজকাল চিকিৎসকেরা বলছেন, মাথা ধরার জন্য যখন তখন এই ধরনের বটিকা গলাধঃকরণের ফলে পাকস্থলীর রক্তক্ষরণে আক্রান্ত হয়েছেন এমন রোগীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান।

অথচ এই ধরনের পরিণতি থেকে আত্মরক্ষা কোনো কঠিন কাজ নয়। যে রোগ আমাদেরই সৃষ্টি তা থেকে আমরা দূরে থাকতে পারব না কেন? একটু সজাগ হলে, একটু সতর্ক থাকলে, একটু সুবিবেচনার পরিচয় দিলে আমরা তো সহজেই ওই সব পরিণতি থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারি।

কোন্ খাদ্যে কতটা প্রোটিন আছে ?

তালিকা	সাধারণ মাপ	ওজন (গ্রাম)	প্রোটিন (গ্রাম)
ভাত	১ কাপ	২৪০	৪
রুটি	১টি মাঝারি	৪০	৩
পাঁউরুটি	১ স্লাইস	৩০	২
ডাল	১ কাপ	২৪০	৭
মাংস	১ বড় হাতা	১০০	২০
পমফ্রেট মাছ	২ টুকরা	১০০	২২
ডিম	১ মাঝারি	৫০	৬·১
গোরুর দুধ	১ কাপ	২০০	৬·৪
অঙ্কুরিত ছোলা বা মুগ	১ টেবিল চামচ	২০	৪·১
বিস্কুট	২টি	—	১·৪
পাকা কলা	১টি	—	০·৫
ছোলার ছাতু	১ টেবিল চামচ	২৫	৫·৫
গমের ছাতু	১ টেবিল চামচ	২০	৩·০
দুধ	১।২ কাপ	—	৫·৬
ছোলার ছাতু	২ চামচ		
চিনি	১ চামচ		

টালির নালার জল গঙ্গাকে কতটা দূষিত করছে ?

কলকাতার দক্ষিণে টালির নালা দিয়ে যে আবর্জনা গঙ্গায় এসে পড়ছে, তা নিয়মিত গঙ্গার জলকে দূষিত করে চলেছে। শহরের যাবতীয় দূষিত পদার্থ নিয়ে টালির নালার ভেতর দিয়ে দৈনিক প্রায় ৩ কোটি গ্যালন ময়লা জল নদীগর্ভে এসে পড়ে।

কী নেই এই টালির নালার জলে ?

মানুষের কতটা প্রোটিন লাগে ?

	ওজন	কত গ্রাম প্রোটিন দরকার ?	
পুরুষ	৫৫ কেজি	৫৫ গ্রাম	
স্ত্রী	৪৫ ,,	৪৫ ,,	
শিশু		প্রতি কেজিতে ওজনের জন্য	
	০-৩ মাস	২.৩ গ্রাম	
	৩-৬ মাস	১.৮ গ্রাম	অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশ চাই আমিষ প্রোটিন
	৬-৯ মাস	.৮ গ্রাম	
	৯-১২ মাস	১-৫ গ্রাম	
	১-০ বছর	১৭ গ্রাম	
	২-০ বছর	১৮ গ্রাম	
	৩-০ বছর	২০ গ্রাম	
	৪-৬ বছর	২২ গ্রাম	
	৭-৯ বছর	৩৩ গ্রাম	
	১০-১২ বছর	৪১ গ্রাম	
বালক	১৩-১৫ বছর	৫৫ গ্রাম	
	১৭-১৮ বছর	৬০ গ্রাম	
বালিকা	১৩-১৮ বছর	৫০ গ্রাম	

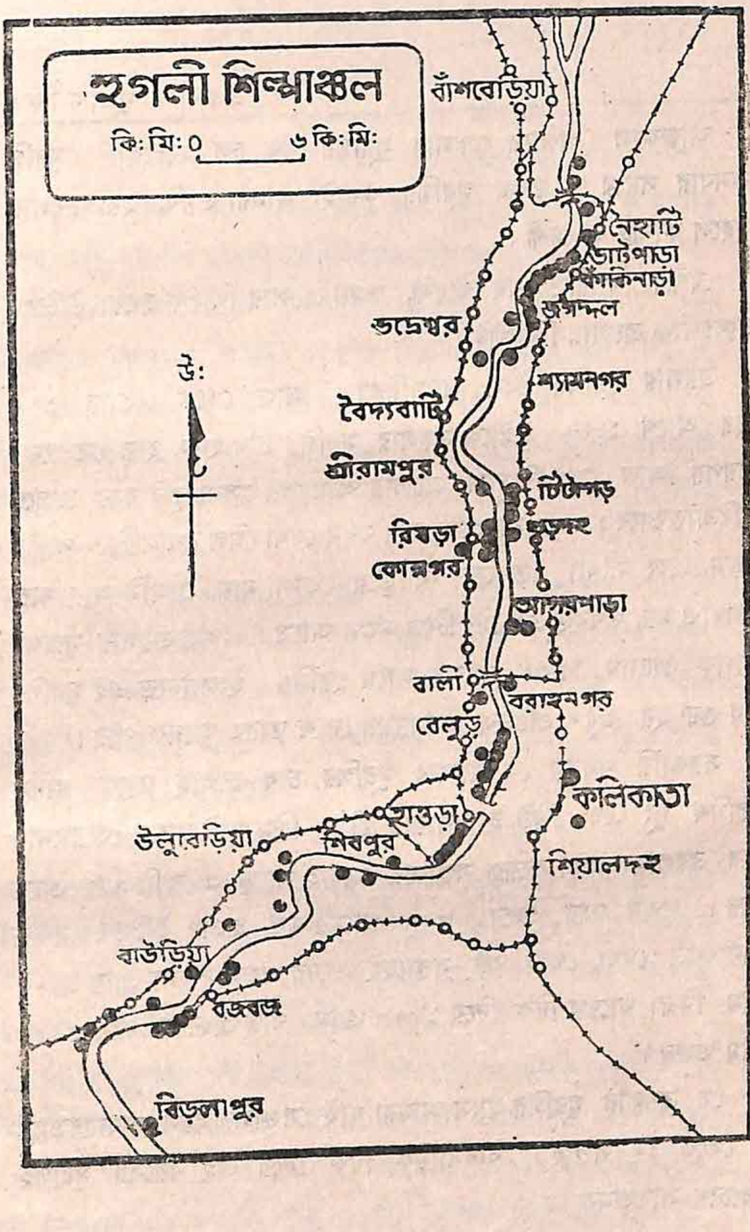
পয়ঃপ্রণালীর ময়লা, দূষিত অজস্র পদার্থ এবং সমস্ত ধরনের পৌরসভার আবর্জনা। যদি আমরা মনে করি, শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখার জন্যে তার যাবতীয় উচ্ছিষ্ট ধাপার মত গঙ্গায় গিয়ে বিসর্জন দেওয়া যায়, তাহলে তার চেয়ে মারাত্মক ভুল আর কিছু নেই।

বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, টালির নালা থেকে যে ময়লা জল গিয়ে জমা হচ্ছে নদীগর্ভে, তার দূষিতকরণের মাত্রা আশঙ্কাজনক। এই মাত্রাটির নাম বি ও ডি বা বায়োকেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড। টালির নালা দিয়ে যে ময়লা জল রোজ নদীতে এসে মিশছে তার বি ও ডি মাত্রা ৫০-এর উর্ধ্বে। পানীয় জলের ক্ষেত্রে এই মাত্রা হওয়া উচিত মাত্র ৩।

কিন্তু গঙ্গার জলকে দূষিত করছে শুধু তো টালির নালা নয়। টালির নালা ছাড়া এই জলকে দূষিত করে চলেছে বাঁশবেড়িয়া থেকে বিরলাপুর পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ১০০ কিলোমিটার বিস্তৃত নদীর দুধারের অজস্র কল-কারখানা ; নদীর দুই তীরে এরা প্রায় সমসংখ্যায় অবস্থিত। এই সব কল-কারখানার মধ্যে আছে কাগজকল, পাটের কারখানা, মদ তৈরির প্রতিষ্ঠান। এ থেকে যতগুলি দূষিত জলের ধারা নদীতে এসে মিশছে সংখ্যায় তা প্রায় ৩৫০-এর কাছাকাছি। যে আবর্জনা এই সব কল-কারখানা থেকে দৈনিক এসে পড়ছে গঙ্গায়, পরিমাণে তা প্রায় ৭৮ কোটি গ্যালন। শিল্পের এই বিপুল পরিমাণ আবর্জনার দূষিতকরণ মাত্রা বি ও ডি-এর সর্বোচ্চ সীমা হওয়া উচিত ৩০। কিন্তু হুগলীর দুধারের কারখানা থেকে নদীতে যে আবর্জনার ধারা এসে পড়ছে, তা ওই মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে।

আজকাল সবাই আমরা পরিবেশ দূষিতকরণের কথা বলি। কিন্তু স্ব-ইচ্ছায় এবং সজ্ঞানে আমরা যে ভাবে গঙ্গার জলকে দূষিত করে চলেছি, তা বলবার নয়।

অন্তত পক্ষে টালির নালার ক্ষেত্রে কি কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করা যায় না ?



হুগলী শিল্পাঞ্চল
কি: মি: 0
৬ কি: মি:
উ:
বাঁশবেড়িয়া
নৈহাটি
ভাটপাড়া
কাঁকিনাড়া
জগদ্দল
ভদ্রেশ্বর
শ্যামনগর
বৈদ্যবাটি
শ্রীরামপুর
টিটাগড়
রিষড়া
কোন্নগর
আগরপাড়া
বালী
বরাহনগর
বেলুড়
কলিকাতা
হাওড়া
উলুবেড়িয়া
শিবপুর
শিয়ালদহ
বাউড়িয়া
বজবজ
বিড়লাপুর

ব্রয়লার মুরগি কি ?

আজকাল বাজারে ব্রয়লার মুরগির খুব চল হয়েছে। মুরগি কিনবার সময়ে দু রকম মুরগির কথাই আমরা ভাবি, হয় ব্রয়লার নাহলে কানট্রি বা দেশী।

দেশীর বিপরীত যখন বিদেশী, তখন ব্রয়লার বিদেশী হওয়া উচিত। প্রকৃতপক্ষে ব্রয়লার বিদেশীই।

ব্রয়লার মুরগির উৎস আমেরিকা। আজ থেকে প্রায় ১০০ বছর আগে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রয়লার মুরগির চাষ শুরু হয়ে সেখানে। তারপর আজ দেশ-বিদেশে ব্রয়লার আমাদের রসনা তৃপ্ত করে চলেছে অবিশ্রান্তভাবে। মাংসের প্রয়োজনে যখন দেখা গেল পোলট্রিতে পাখীর ওজন এবং সংখ্যা যত দ্রুত বাড়িয়ে তোলা যায়, তেমনি আর অন্য কোথাও নয়, তখনই এই দিকটিতে নজর আসে। কিন্তু ব্রয়লার মুরগির ব্যাপক প্রচলন ১৯৩০ সালের আগে হয়নি। ইংল্যানডে এই মুরগির চাষ শুরু হয় ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে, আমাদের দেশে তারও অনেক পরে।

সরকারি পর্যায়ে যে ব্রয়লার মুরগির চাষ চলেছে তাতে আছে করনিশ পুং এবং নিউ হ্যামশায়ার স্ত্রী। ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোনোর পরে ব্রয়লার বাচ্চা কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সাড়ে ৩ কেজি খাদ্য গ্রহণ করে। তখন তার ওজন ১৮০০ গ্রামের মত হওয়া উচিত। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেছে যষ্ঠ সপ্তাহেই এদের ওজন দাঁড়ায় প্রায় ১১০০ গ্রাম কিম্বা খাদ্যের দিক দিয়ে ১৮০০ গ্রাম, খাদ্য গ্রহণের পরে ১০০০ গ্রাম ওজন।

যে ব্রয়লার মুরগির মাংস আমরা খাই সেগুলির বয়স সাধারণভাবে ৮ থেকে ১০ সপ্তাহ। ব্যবসায়িক দিক দিয়ে এই বয়সের মুরগিই সবচেয়ে লাভজনক।

ম্যালেরিয়া রোগীকে কামড়িয়ে সে-মশা আমাকে কামড়ালেই কি আমার ম্যালেরিয়া হবে ?

কোনো ম্যালেরিয়া রোগীকে কামড়ানো ম্যালেরিয়া রোগের বাহক অ্যানোফিলিস মশা যদি কামড়ানোর অব্যবহিত পরে এসে আমাদের কামড়ায় তাহলেই কি আমরা ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হব ?

আমাদের দেশ থেকে ম্যালেরিয়া অবলুপ্তির পর আবার তার পুনরাবির্ভাবে সকলেই উদ্বিগ্ন। রোগ নির্মূল হওয়ার পরে কিভাবে আবার দেখা দিল সে আলোচনা এখানে থাক, কিন্তু ম্যালেরিয়া রোগীকে কামড়ানোর পরে সে মশা উঠে এসে আর কাউকে কামড়ালেই যদি সে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয় তো ম্যালেরিয়ার বিস্তার রোধ করা কঠিন।

হাসপাতালে ম্যালেরিয়া রোগীর শয্যা-সংলগ্ন অন্যান্য রোগীরা অনেক সময় অভিযোগ করেন, ম্যালেরিয়া রোগী যথেষ্ট অবরোধের মধ্যে নেই, ফলে রোগ ছড়াচ্ছে, পাশে অন্য ধরনের রোগীরা ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছেন। কিন্তু এসব অভিযোগের মধ্যে কতটা যুক্তি আছে ভেবে দেখা দরকার।

অ্যানোফিলিস মশা কিভাবে ম্যালেরিয়া রোগ ছড়ায় ?

এ কথা ঠিক যে, মশা-ই এই রোগের বাহক এবং একজন ম্যালেরিয়া রোগীর কাছ থেকে আর একজনের সুস্থ দেহে মশা-ই এই রোগ বহন করে নিয়ে চলেছে। তবুও রোগ ছড়াবার ক্ষেত্রে আর একটা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য নিয়ামক আছে। তা হল সময়।

ম্যালেরিয়া রোগীর দেহ থেকে মশা এই রোগের জীবাণু গ্রহণ করে সুস্থ মানুষকে কামড়ালেই সেই নীরোগ মানুষটি ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত হয়ে পড়বে, এমন নয়। ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত কারোর কাছ থেকে জীবাণু নেওয়ার পরে মশাকে প্রায় ১০ দিন নিজের দেহে এই জীবাণুটি

লালন করতে হবে। তবেই মশা ম্যালেরিয়া রোগ-জীবাণু আর একজনের দেহে সংক্রামিত করার ক্ষমতা অর্জন করে।

তাই ম্যালেরিয়া রোগীর ঠিক পাশের মানুষটি ওই রোগটিতে আক্রান্ত হবেন এমনটি নাও হতে পারে। মশা তো গোরু-বাছুরের মত নয় যে, সে খোঁটায় বাঁধা থাকবে। সে উড়ে বেড়ায় এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়। হতে পারে, সে রোগের জীবাণু বহন করে এমন এক জায়গায় নিয়ে গেল, এমন এক জায়গায় রোগ ছড়াল, যেখানে কোনো ম্যালেরিয়া রোগী ছিল না। আবার এমনও অসম্ভব নয়, যেখান থেকে রোগের জীবাণু সংগ্রহ করল, তার আশেপাশের আর কেউই রোগটিতে আক্রান্ত হল না।

তাছাড়া রোগ-সংক্রামক ক্ষমতা অর্জনের জন্য সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে পরিবেশেরও একটা ভূমিকা আছে। রোগ সংক্রামক ক্ষমতা অর্জন করবার জন্যে মশার ১০ দিনের মত সময় তো চাই-ই, সেই সঙ্গে প্রয়োজন একটা উপযুক্ত পরিবেশ। নইলে শুধু ১০ দিনের মত সময়কেই যথেষ্ট বলা যায় না।

তেলাপিয়া কি সস্তার মাছ?

বাজারে আমেরিকান কৈ বা তেলাপিয়া এসেছে খুব বেশি দিনের কথা নয়। কিন্তু এই মাছটিকে এখনও আমরা সকলে তেমনভাবে গ্রহণ করতে পারিনি। কৈ, মাগুর, সিঙ্গির তুলনায় তেলাপিয়া আজও সস্তার মাছ। কিন্তু কেন?

তেলাপিয়ার জন্মবৃত্তান্তের দিকে একবার তাকিয়ে দেখা যাক। মাছটির উৎপত্তির দুটি উৎস: মোজামবিক এবং মালয়েসিয়া। বিদেশ থেকে এই মাছ আসবার পরে এদেশে যদি আমরা তাকে সহজভাবে গ্রহণ করতাম, তাহলে তা আমাদের মাছের অভাব নিশ্চয় মেটাতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, আজও সে জাতে উঠতে পারেনি। সত্যি কথা

বলতে কি, খাদ্যগুণের দিক দিয়ে তেলাপিয়া কোনো অংশেই কৈ মাগুরের চেয়ে নিকৃষ্ট নয়। অবশ্য আকৃতিতে তাকে আমরা ততটা বড় দেখি না। হতে পারে, সেই কারণে তাতে মাছের পরিমাণ তুলনায় কম। কিন্তু কোনোদিক দিয়েই মাছ হিসেবে সে অপাংক্তেয় নয়।

তেলাপিয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় কথা হল, সে বাজারে মাছের ঘাটতি মেটাতে পারে। ভাবলে অবাক হওয়ার কথা! এ কথা মানতেই হবে বাজারে অন্যান্য মাছের ক্ষেত্রে জোগান যথেষ্ট নয়। কিন্তু তেলাপিয়ার চাষ এতই সহজ এবং তার উৎপাদন এতই অপর্যাপ্ত যে চাষের সময়ে তার বিস্তার গাণিতিক সকল প্রগতিকে অতিক্রম করে। তখন তার জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করাই কঠিন।

তেলাপিয়া মাছ অত্যন্ত দ্রুত পরিণত হয়, পূর্ণতা লাভ করে। ফলে এদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে অতি অল্প সময়ে। কিন্তু শুধু সংখ্যাবৃদ্ধিই তো মাছ চাষের আসল লক্ষ্য নয়। তাকে খাদ্য দিয়ে বাড়িয়ে তুলতে হবে, পুষ্ট করতে হবে। নইলে আমের আঁটিসারের মত সে মাছ তো শুধু কাঁটাসার হয়েই থাকবে।

এই খাদ্য সরবরাহের কথা শুনে হয়তো অনেকে চিন্তিত হবেন। তেলাপিয়ার খাদ্য কি? তাকে খাদ্য জোগানোর জন্যে কতটা অর্থ ব্যয়, কতটা পরিশ্রম প্রয়োজন?

না, তেলাপিয়ার ক্ষেত্রে সে রকম কোনো ব্যাপারই নেই। তেলাপিয়া এমন একটি মাছ যা নিরামিষাশী এবং পুকুরের শ্যাওলা খেয়ে যা বেঁচে থাকতে পারে। ফলে এদিক দিয়েও নিশ্চিন্ত। আত্মরক্ষাতেও এরা পারঙ্গম এবং সে আত্মরক্ষা করে অদ্ভুত উপায়ে। বিপদের আশঙ্কা দেখলে এরা ঝাঁকে ঝাঁকে আশ্রয় নেয় জনক তেলাপিয়ার (পুং) হাঁয়ের ভিতরে অর্থাৎ তেলাপিয়া নিজেই নিজের আত্মরক্ষায় সমর্থ।

এ রকম একটি মাছকে আমরা খাদ্য হিসাবে গ্রহণে পরাঙ্মুখ থাকব কেন?

গরমে বাইরে থেকে এসেই ঠাণ্ডা জল খাব না কেন ?

দুঃসহ গরমে বাইরে থেকে ফিরে এসেই বা মাথায় চড়া রোদ নিয়ে কোথাও পৌঁছেই এক গেলাস ঠাণ্ডা জল খাবার জন্য ব্যস্ত হওয়া ঠিক নয়। একটু বিশ্রাম, পাখার তলায় বসে দু-চার মিনিট জিরোনো, ঘাম শুকিয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা—এটুকু করতেই হবে, যতক্ষণ না দেহ স্বাভাবিক উত্তাপে নেমে আসে।

দুরন্ত গরমে আমরা অনেক সময় রাস্তায় দাঁড়িয়ে কোল্ড ড্রিঙ্কসেও দেহকে শীতল করি। কোল্ড ড্রিঙ্কস অর্থাৎ বরফে রাখা কিম্বা ডিপ ফ্রিজ থেকে বের করে আনা পানীয়। একটি অসহ্য গরমের দিনে বাইরে থেকে এসে কলসির এক গেলাস ঠাণ্ডা জলপানের মধ্যে শরীর জুড়ানো ছাড়া যদি অন্য কোনো প্রতিক্রিয়া থাকে তবে তার চেয়ে অনেক গুরুতর প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত রাস্তায় দাঁড়িয়ে কোল্ড ড্রিঙ্কস পান করার।

এই ধরনের পান কি শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর ? শরীরের কোনো অনিষ্ট করে ? আমাদের অনেকের ধারণা বাইরে থেকে এসে তড়িঘড়ি জলপান উচিত নয়। কেউ বলেন, ঘাম বসে যায়, কেউ বলেন সর্দি-গর্মি হয়। যাই হোক, এ রকম অবস্থায় শরীরের স্বাভাবিকত্ব যে বিঘ্নিত হয়, এ কথা সত্য। কিন্তু কেন ?

আমাদের শরীরে যে উত্তাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আছে, সেই ব্যবস্থায় উত্তাপ নিয়ন্ত্রিত হয় ক্রমে ক্রমে। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ধারাবাহিক। প্রচণ্ড উত্তাপ মাথায় করে এনে দেহকে নিমজ্জিত করলাম শীতল জলের চৌবাচ্চায় অথবা আকণ্ঠ বরফ জল পান করলাম—তার ফল কি হবে ? ফল হবে এই যে, শরীরকে সুস্থ, স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধক্ষম রাখার জন্য শারীরিক যে ব্যবস্থা প্রতিনিয়ত সক্রিয় আছে তা

অকস্মাৎ বিপর্যস্ত হবে। মুশকিল দেখা দেয় তখনই। রাজার শিবির বিশৃঙ্খল হলেই শত্রুপক্ষের আক্রমণ সফল হয়। আমরা তো মারী নিয়ে ঘর করি। অজস্র ব্যাকটেরিয়া আমদের শরীরে প্রতিনিয়ত অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছে। কোনো অনুকূল পরিবেশে অর্থাৎ আমাদের শরীরের কোনো বিশৃঙ্খল মুহূর্তে তারা দেহাভ্যন্তরে প্রবেশের সুযোগ পায়। গরম থেকে এসে জল খেলেই সে রকম এক মুহূর্ত সৃষ্টি হতে পারে। শরীরে নানা উপসর্গ দেখা দেওয়ার আশঙ্কা তখনই।

ছোট কৃমি কিভাবে শরীরে যায়?

ছোট কৃমিতে কখনো কখনো শিশুরা অস্থির হয়ে ওঠে আমরা বুঝতে পারি, কিন্তু শিশুদের শরীরে এই কৃমি কিভাবে প্রবেশ করে?

আমারা অনেক সময়ে বলি, বেশি মিষ্টি খেতে নেই। তাতে কৃমি হয়। কিন্তু এরকম ধারণার পিছনে কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই।

দেহের মধ্যে ছোট কৃমির ডিম ঢোকে মুখ দিয়ে, অন্য কোনোভাবে নয়। এই ধরনের কৃমির আয়ু ৬ থেকে ৮ সপ্তাহের মত। মলদ্বারের চারপাশে এরা সচরাচর সন্ধের সময়ে বেরিয়ে ডিম ছাড়ে। সেই ডিম বাচ্চার হাত ঘুরে মুখে যায়। বাচ্চা লজেন্স খায়, বিস্কুট খায়, মাটিতে ফেলে, আবার কুড়োয়, মুখে দেয়। ওই মুখে দেওয়া হাতের ভেতর দিয়েই কৃমির ডিম শরীরে প্রবেশ করে। ফলে শরীরে কৃমি সাধারণত থেকেই যায়।

যে জীবাণুর অনুপ্রবেশ মুখ দিয়ে তাকে বয়স্করা রোধ করতে পারে কিন্তু ছোটরা? সেখানে গুরুজনেরা সতর্ক না হলে কোনো উপায় আছে মনে হয় না।

দুধে কি নুন মেশানো অনুচিত?

দই আমরা অনেক সময়ে নুন দিয়ে মেখে খাই। ঘোলেও নুন ছিটোই। কিন্তু দুধ? কখনো নুন মিশিয়ে দুধ খাওয়ার কথা তো শোনা যায় না। দুধে নুন? নৈব নৈব চ, শৈশব থেকে বরাবর এই কথাটাই শুনে এসেছি; দুধে নুন মিশিয়ে খাওয়া উচিত নয়। কেন? এর পিছনে কি কোনো বৈজ্ঞানিক কারণ আছে? না কি বৈজ্ঞানিক যুক্তিহীন এ এক সংস্কারমাত্র।

দুধে নুন মেশালে অবস্থাটা কী দাঁড়ায়? নুনে আছে সোডিয়াম। দুধেও সোডিয়াম। ফলে দুধের সঙ্গে নুন যুক্ত হলে সোডিয়ামের আতিশয্য ঘটবে। কিন্তু সে আতিশয্য তো ঘোলে বা দইয়েও হতে পারে।

তাহলে সোডিয়ামের আতিশয্য আসল কথা নয়। সোডিয়াম যাঁর কম দরকার তিনি নুন মিশিয়ে দুধ খাবেন না, ঘোলও নয়, দইও নয়। শুধু দুধে নুন মেশানোর কথা সেখানে আসে না।

তবে দুধে নুন মেশানো উচিত নয়, কথাটা কেন আমরা অনেকেই শুনে এসেছি? বৈজ্ঞানিক দিক দিয়ে বোধহয় এর কোনো কারণই নেই। অবশ্য আস্বাদনের দিকটি আছে। খাওয়ায় এই আস্বাদনেরও একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকে। দুধে নুন মেশালে স্বাদ কিছুটা খারাপ লাগতে পারে। হয়তো সে বেশি নোনতা মনে হবে, তার স্বাভাবিক স্বাদের পরিবর্তন ঘটবে। কে বলবে, দুধে নুন মেশানোর নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে এই ভাবনার ভূমিকাই সর্বাধিক কিনা।

লাল কাঁচের চুড়ি কোথায় পাব?

এ কথা আমরা ক'জন জানি—যে কোনো লাল কাঁচের জন্যে অন্য দেশকে আমাদের কিছু অর্থদণ্ড দিতে হয় এবং তার পরিমাণ কম নয়। মনোরঞ্জনের প্রয়োজনে হাতে পাঁচটি লাল কাঁচের চুড়ি অতি সামান্য। মনে হবে সম্পূর্ণ কুটীরশিল্পের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। কিন্তু তা নয়, এর সঙ্গেও রয়েছে বিদেশী মুদ্রার নিবিড় সম্পর্ক। শুধু শোভন হাতের কয়েক গাছা কাচের চুড়িতেই নয়, ট্রাফিক সিগন্যালের নিষেধাজ্ঞাজ্ঞাপক সংকেতেও আমরা লাল কাচ দেখি। জল, স্থল বা আকাশ-পথে যেখানেই হোক না কেন, নিষেধাজ্ঞাজ্ঞাপক লাল সংকেতের পরিচয়ে আছে আত্মনির্ভরতার অভাব এবং পরমুখাপেক্ষী দীনতা।

এই লাল কাচের রঙ্গীনত্বের জন্যে অপরিহার্য যে বস্তু তার নাম সেলেনিয়াম। অনেক কিছুর মতনই আমাদের দেশে এ পদার্থটির উৎপাদন শূন্য। ফলে যে কোনো ব্যবহারেই লাল কাঁচের জন্য এই পদার্থটি আমাদের বরাবর বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়।

আমাদের কলকাতা শহরেই এর বিকল্প আবিষ্কার এবং এই আবিষ্কার সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা, এ আবিষ্কার দেশজ পদার্থ দিয়ে। নিজ হাতে গড়া কাঁচা ঘরও খাসা হয়। কিন্তু ঘর যদি পাকা হয় তা হলে তো আর কথাই নেই। সেলেনিয়ামবিহীন লাল কাঁচের ব্যবহারিক উপযোগিতা আছে। ফলে আমাদের দেশের সমস্ত লাল কাচ থেকেই বিদেশী ছোঁয়াটুকু মুছে যাওয়ার কথা।

বিদ্যুতের খরচ কত ?

আমাদের সাংসারিক জীবনে বিদ্যুতের যে ব্যবহার তার প্রাথমিক প্রয়োজন আলো জ্বালানোয়। দিনের আলো নিভে আসবে—ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ, বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় সে অন্ধকার দূর করে চারিদিক আলোকিত করে তুলবে—এই আমাদের আকাঙ্ক্ষা এবং আগেকার অভিজ্ঞতা। যদিও আমরা আবার মাটির প্রদীপ আর মোমবাতির যুগে ফিরে যাচ্ছি বলে অনেকেই স্বাভাবিকভাবে আশঙ্কা বোধ করছি।

বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্রমসঙ্কোচনে বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও আমাদের সকলের মিতব্যয়ী হওয়া দরকার। ফলে কিসে কতটা বিদ্যুতের প্রয়োজন তার একটা হিসেব রাখা যেতে পারে।

বাড়িতে যদি পাঁচটা ৬০ ওয়াটের বালব জ্বলে—সবগুলি একসঙ্গে জ্বলবে না রোজ সন্ধ্যা ৬টা থেকে ১১টা এই পাঁচ ঘণ্টা সময়; কিন্তু গড়ে যদি আলো বিকিরণ করে প্রতিদিন ২ ঘণ্টা সময় নিয়ে তাহলে মাসে যে পরিমাণ বিদ্যুতের প্রয়োজন ঘণ্টার হিসেবে তা ৬০ × ৫ × ২ × ৩০ = ১৮০০০ ওয়াটের সমান। কিন্তু ১ কিলো ওয়াট বা ১০০০ ওয়াট বিদ্যুৎ অর্থাৎ ১ ইউনিট। ফলে সারা মাসে ওই পাঁচটি ৬০ ওয়াটের বালবের জন্যে ১৮ ইউনিট বিদ্যুৎ প্রয়োজন।

আলো, পাখা, রেডিও, টেলিভিশন, ফ্রিজ, বিদ্যুতের খরচ আছে সর্বত্রই কিন্তু যেখানে তাপ সৃষ্টির প্রয়োজনে বিদ্যুতের ব্যবহার সেখানে বিদ্যুতের প্রয়োজন অনেক বেশি। যেমন ইস্ত্রি বা হিটার। যদি উভয়ই ৭৫০ ওয়াটের হয় আর ইস্ত্রি চলে রোজ ১ ঘণ্টা ও হিটার ২ ঘণ্টা তাহলে ইস্ত্রির প্রয়োজন ২২·৫ ইউনিট এবং হিটারের ৪৫ ইউনিট—এ পরিমাণ কম নয়।

ফলে বিদ্যুতের মিতব্যয়িতার ক্ষেত্রে উত্তাপ উৎপাদনকারী সরঞ্জামের পরিমিত ব্যবহারের দিকে আমরা সবাই একটু দৃষ্টি দিতে পারি।

যে পঞ্জিকা আমরা ঘরে রাখি, তা কতটা নির্ভুল ?

যে পঞ্জিকা আমরা ব্যবহার করি, তা কতটা বিশুদ্ধ এবং বিজ্ঞান-সম্মত ?

গুণাগুণ বিচারের পূর্বে তাহলে তার মূল্যের দিকে লক্ষ্য করা দরকার। পঞ্জিকার প্রয়োজন কেন এবং সে আমাদের কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে ?

পঞ্জিকার দুটি উদ্দেশ্য। এক ঃ পঞ্জিকা একটি বর্ষপঞ্জী—দিন, তারিখ এবং মাসের হিসাবযুক্ত। লৌকিক নানাবিধ কাজে এটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় ; অর্থাৎ তারিখ নির্দেশে এবং সময়ের বিচারে একটি অপরিহার্য ভূমিকা আছে, যা ভিন্ন কর্তব্যকর্ম অসম্পূর্ণ। দুই ঃ বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান তিথিনির্ভর। বিবাহ, উপনয়ন, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি ব্যক্তিগত শুভকার্য এবং পূজাপার্বণ প্রভৃতি সার্বজনীন অনুষ্ঠানগুলির সময়কাল তিথি অবলম্বনে স্থির করা হয়। পঞ্জিকায় সেগুলির উল্লেখ থাকে।

যে কোন ধরনের পঞ্জিকাই হোক, তা হওয়া উচিত ঋতুনিষ্ঠ বর্ষপঞ্জী। প্রচীনকালে তারকানির্ভর যে সময় বিভাজন পদ্ধতি বিভিন্ন দেশে প্রচলন লাভ করেছিল জীবনধারণের প্রয়োজনে, ঋতুনির্ণয় ছিল তার আসল উদ্দেশ্য। পঞ্জিকার প্রধান উপযোগিতা ছিল সেখানে। যে বর্ষ-মাসের দ্বারা কৃষিকার্য নির্ণয় করা সম্ভব, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ঋতুর পূর্বাভাষ দেওয়া যায়, উপযোগিতা হিসাবে সেই রকম বর্ষগণনা পদ্ধতি শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যে বাংলা পঞ্জিকা আমাদের হাতে হাতে ফেরে, তা ঋতুনিষ্ঠ বর্ষপঞ্জী নয়।

কেন নয় ?

আমাদের ভারতীয় পঞ্জিকা নিরয়ণ পঞ্জিকা। এই নিরয়ণ পঞ্জিকার

অসুবিধা হল এই যে, বছরের প্রথম মাসের সূচনার পূর্বেই ঋতুভিত্তিক বর্ষসূচনা হচ্ছে।

এ কালে বৈশাখ মাসের সূচনা কখন? হয় ১৪ এপ্রিল, না হয় ১৫ এপ্রিল। জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক দিক দিয়ে এ সূচনা বিলম্বিত। যে ইংরেজি পঞ্জিকার ব্যবহার সর্বত্র নজরে আসে, সে পঞ্জিকা সায়ন, রবির গতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট; অন্যদিকে ভারতীয় পঞ্জিকা নিরয়ণ পদ্ধতিবিশিষ্ট। আমাদের বর্ষসূচনা হওয়া উচিত মহাবিষুব সংক্রান্তির পর দিন থেকে। তাহলে ঋতু আরম্ভের সঙ্গে বর্ষ সূচনার পারম্পর্য রক্ষিত হয়। অন্যথা ঋতুরা এগিয়ে আসে। গ্রীষ্মের আবির্ভাব হয় গ্রীষ্মের পূর্বে। অন্য ঋতু সম্পর্কেও সেই কথা। কে না চায় গ্রীষ্মের ফল গ্রীষ্মেই আমাদের রসনা তৃপ্ত করুক, বর্ষার ফুল বর্ষাতেই ফুটুক, শীতের হাওয়ায় যে নাচন লাগে, সে যেন লাগে প্রকৃত শীতের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে।

মহাবিষুব সংক্রান্তি ২১ মার্চ। তাহলে ২২ মার্চ সেই নির্ধারিত দিনটি। বিযুববৃত্ত এবং ক্রান্তিবৃত্তের ছেদ বিন্দুতে সংক্রমণ। বিষুববৃত্ত Equator এবং ক্রান্তিবৃত্ত Ecliptic। সূর্য মহাকাশে পূর্বমুখী একটি নির্দিষ্ট গতিতে বৃত্তাকার পথে একটি আবর্তন সম্পূর্ণ করে। এই পথটিই ক্রান্তিবৃত্ত। ক্রান্তিবৃত্ত এবং বিষুববৃত্তের ছেদবিন্দু দুটির একটিতে বাসন্তিক বিষুব দিন, অন্যটিতে শারত বিষুব দিন। বাসন্তিক বিষুব দিন ২১ মার্চ, শারদ বিষুব দিন ২৩ সেপ্টেম্বর। এই দুটি দিনের সর্বত্র দিনমান এবং রাত্রিমান সমান। বর্ষসূচনা হওয়া উচিত বাসন্তিক বিষুব দিনের পরদিন ২২ মার্চ থেকে।

কিন্তু বছরের সূচনার আজ পার্থক্য ঘটেছে এবং বিশুদ্ধিকরণের অভাবে সে পার্থক্য বেড়ে চলেছে। এর বার্ষিক পরিমাণ ৫০.২ সেকেণ্ড। ফলে প্রতি বছরই ঋতুচক্রের সূচনা হয় ওই পরিমাণ সময় পূর্বে। কিন্তু ৭২ বছরে সে পরিমাণ ১ দিনের সমান। বর্তমানে গ্রীষ্মকাল এবং বর্ষসূচনা ১৪ বা ১৫ এপ্রিল। ২২ মার্চ থেকে ১৪।১৫ এপ্রিলের পার্থক্য যথেষ্ট।

ভারতীয় পঞ্জিকা সর্বশেষ পরিমার্জিত হয়, আর্যভটের (জন্ম ঃ ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দ) সময়ে। আর্যভট যে পঞ্জিকা গ্রহণ করেন, তা ছিল নিরয়ণ পদ্ধতি বিশিষ্ট—মেষ, বৃষ প্রভৃতি বারো রাশির ভ্রমণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ফলে বর্ষসূচনা এবং ঋতুচক্রের প্রারম্ভের পার্থক্য আজ ৭২ বছরে ১ দিনের হিসাবে প্রায় ২৩ দিনে এসে পৌঁচেছে।

ভারতবর্ষে এই জাতীয় সৌরপঞ্জীর প্রচলন আছে পশ্চিমবাংলায়, আসামে, উড়িষ্যায়, মাদ্রাজে এবং কেরলে। সৌরমাসের নামগুলিও সর্বত্র এক নয়। আমারা যে মাসটিকে বৈশাখ মাস নামে অভিহিত করি, দক্ষিণ ভারতে সেটাই চিত্তিরাই নামে পরিচিত। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে এই সৌরপঞ্জীর প্রচলন নেই।

সৌরপঞ্জিকার ক্ষেত্রে সূচনার দিনটিতে পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়। পার্থক্য সাধারণভাবে ১ দিনের বা ২ দিনের। পশ্চিমবঙ্গে রবির সংক্রমণ অর্থাৎ এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে গমন দিবসকে মাসের শেষ দিন বলে। কিন্তু অন্যান্য প্রদেশে ওই দিনটি মাসের শেষ দিন নয়। সেখানে ওই দিনটি মাসের প্রথম দিন হিসাবে নির্দিষ্ট। আবার অঞ্চলবিশেষে সংক্রান্তির ক্ষেত্রেও বিভিন্নতা আছে। সৌরপঞ্জিকায় পশ্চিমবঙ্গে সংক্রান্তি দিবস যদি রাত ১২ টার পূর্বে হয়, তবে সেই দিনই সংক্রান্তি বা মাসান্ত। কিন্তু যদি রাত ১২টার পরে হয় তবে পরের দিনই সংক্রান্তি বা মাসান্ত। পশ্চিমবঙ্গে যেখানে মধ্যরাত্রের পূর্বাপর ভেদে সংক্রান্তি দিবস নির্ণীত হয়, উড়িষ্যায় সেইরকম সূর্যোদয়ের পূর্বাপর ভেদে সংক্রান্তি দিবসের গণনা হয়ে থাকে ; আবার সেখানে সংক্রান্তি দিবসই মাসের প্রথম দিন।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গে একই সৌরপঞ্জীর ব্যবহার হলেও এখানে দু'রকমের পঞ্জিকার প্রচলন আছে। এক—দৃকসিদ্ধ, দুই—প্রাচীনপন্থী। এই দু'ধরনের পঞ্জিকার প্রচলনের জন্য এখানে অনেক সময়ে একই দিন দুটি ভিন্ন তারিখ দিয়ে নির্দেশিত হয়েছে, লক্ষ্য করা যায়। এরকম বৈষম্য কদাচিৎ হয়, এমন কথা বলা যায় না ; ফলে কার্যক্ষেত্রে প্রায়ই

বিস্তর অসুবিধা দেখা যায়। দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকায় রবির অবস্থানসূত্র আধুনিক পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে। অন্যদিকে প্রাচীনপন্থী পঞ্জিকায় যে রবির অবস্থান নির্ণয় করা হয়, তার সূত্র দেড় হাজার বছর আগেকার গবেষণালব্ধ। ফলে রবির অবস্থান নির্ণয় সামান্য প্রভেদ বলেই সংক্রান্তি দিবসে পার্থক্য ঘটে। সুতরাং দুই পঞ্জিকার মাসের শেষ তারিখ ভিন্ন হয়। তখন পরবর্তী মাসের সূচনাতেও হেরফের লক্ষ্য করা যায়।

পঞ্জিকার নানা হেরফেরের জন্য প্রয়োজন একটি বিজ্ঞানসম্মত জাতীয় বর্ষপঞ্জী। এই উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের বৈজ্ঞানিক এবং শিল্প গবেষণা পরিষদ ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে একটি Calender Reform Committee গঠন করেন। এর সভাপতি নির্বাচিত হন ডক্টর মেঘনাদ সাহা এবং সম্পাদক শ্রীনির্মলচন্দ্র লাহিড়ী। কমিটি বিবরণী পেশ করেন ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে। বিবরণীতে একটি সর্বভারতীয় পঞ্জিকার প্রস্তাব পেশ করা। এটি সর্বভারতীয় লৌকিক কার্যে ব্যবহারের উপযুক্ত। এই পঞ্জিকাটি সায়ন বা ঋতুনিষ্ঠ বর্ষভিত্তিক।

তারপর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে। জাতীয় বর্ষপঞ্জীর উদ্দেশ্য ছিল সর্বভারতীয় প্রচার এবং স্বীকৃতি লাভ; কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, আজও জনসাধারণের সঙ্গে তার তেমন কোনো সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি।